যুগে যুগে : দিলীপ দাস

হুগলী জেলার আনুর গ্রাম–

এই বাড়ীতেই ক্ষুদিরাম চাটুজ্জের মেয়ে কাত্যয়ণীর বিয়ে হয়েছে। কদিন হল তাকে ভূতে পেয়েছে।

হুঁ, শুনছি কাত্যায়ণীর বাবা শীগগির এখানে আসবেন

ঐ তো ক্ষুদিরাম বাবু আসছেন।

ক্ষুদিরাম বাবুকে দেখতে দেবতার মত। কামার পুকুরে ওঁর মত তেজস্বী ধার্মিক ব্রাহ্মণ আর কেউ নেই।

ঠিক বলেছিস। সৎ না হলে কেউ জমিদারের মুখের উপর বলতে পারে মিথ্যে সাক্ষী দেব না!

জমিদারের চক্রান্তে ওনার সব সম্পত্তি গেছে। এখন কামার পুকুরে আছেন। বড় ছেলে রামকুমার আর মেয়ে কাত্যায়ণী

হ্যাঁ, কয়েক বছর হল ওনার রামেশ্বর নামে একটি ছেলে হয়েছে।

চল ভিতরে গিয়ে ব্যাপারটা দেখি। কিন্তু এখন ওর সংসার চলে কি করে?

ভগবানে বিশ্বাস, তাই তাঁর অভাব হয় না।

বাড়ীর মধ্যে ভূতে পাওয়া কাত্যায়ণীকে ঘিরে বেশ ভিড় হয়েছে। ওঝাও এসেছে

এই মন্ত্রপড়া সরষে মারছি শীগগির এই মেয়েটাকে ছেড়ে চলে যা

নাঁ যাঁব নাঁ তোঁর ঘাঁড় মঁটকাবোঁ

বুঝলেন বাবুরা, এ বড় দুষ্টু ভূত আমার মন্ত্রে কাজ হবে না

দেখি দেখি কি হয়েছে। তুমি সরে যাও।

তুমি কে? তুমি একে কষ্ট দিচ্ছ কেন?

আঁমি ঐ নিম গাঁছে থাঁকি। আঁমার বঁড় কঁষ্ট।

তুমি আমার মেয়েকে ছেড়ে দাও

তুঁমি আঁগে বঁল আঁমার জঁন্য গয়াঁয় পিঁন্ডি দেঁবে।

তুমি চলে গেছ, জানব কি করে

ঐ নিম গাঁছের ডাঁলটা ভেঁঙে পড়বে।

(ক্রমশঃ)

এক মাস পরে-আনুর গ্রামে ভূতে পাওয়া মেয়েটির কুঁড়ের সামনে নিমগাছের ডালটা হঠাৎ ভীষণ নড়ে উঠল
পালাও ভূত খেপেছে
মেয়েটা ঘরের মধ্যে হঠাৎ উঠে বসেছে।
আজ শরীরটা খুব ভালো লাগছে।
এদিকে নিমগাছের ডালটাও সশব্দে ভেঙে পড়ল।
মড়াৎ
?!
ভূতটা তাহলে মুক্তি পেল!
সেদিন গয়াধামে পিণ্ডি দিয়ে ক্ষুদিরাম রাতে ধর্মশালায় শুয়ে স্বপ্ন দেখছেন.
এবার আমি তোমার ঘরে যাব।
আমরা বড় গরীব, কি করে সেবা করবো

যেদিন ক্ষুদিরাম গয়ায় পিণ্ডি দিচ্ছিলেন, সেদিন ক্ষুদিরামের স্ত্রী চন্দ্রমণি যুগিদের শিবমন্দিরের সামনে প্রতিবাসিনী ধনীকামারনীর সঙ্গে কথা বলছিলেন —

মা ঠাকুরমশাই গয়া থেকে কবে আসবেন?

সেই কথাই ভাবছি

দেখ দেখ ধনী, শিব-মন্দির থেকে একটা আলো এসে আমার মধ্যে ঢুকছে

পোঁ-ওঁ-ওঁ-ওঁ-ওঁ

ঠাকুর মশায়ের চতুর্থ সন্তান হল

এক বছর পর কামার পুকুরে ক্ষুদিরামের বাড়ী থেকে শাঁখের শব্দ আসছে —

শুনেছি, গয়া থেকে স্বপ্ন পেয়েছেন

তখন কলকাতায় পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিরা—

যা বলেছিস, এসব বামুনদের চালকলা বাঁধার ফন্দী—

কি কুসংস্কার! শেষকালে পুতুলকে ভগবান বলে পুজো!

এখন বিজ্ঞানের যুগ। আর অং-বং চলবে না

৪

(ক্রমশঃ)

কামার পুকুরে ছেলে কোলে নিয়ে মা চন্দ্রমণি ও কয়েকজন পল্লীনারী

রোজ ভাবি আর আসব না। কিন্তু সকাল হলেই মনটা আসার জন্যে উসখুস করে

চন্দ্রাদি, তোমার ছেলে আমাদের টেনে আনে। কালো ছেলের কি টান গো!

চন্দ্রমণি ও ক্ষুদিরাম

খোকা দেখতে দেখতে এক বছর হল, গরুর দুধের কি হবে?

ভেবনা গিন্নী, গদাই আমাদের গয়ার গদাধর। নিজের ব্যবস্থা নিজেই করবে।

এমন সময়-

ঠাকুর মশাই বাড়ী আছেন

কে ভেতরে এস।

মেদিনীপুর থেকে আপনার ভাগ্নে গরুটা পাঠিয়ে দিলেন খোকার দুধের জন্যে

দেখছ গিন্নী ঠাকুরের লীলা

বাবা, তুমি অনেক দূর থেকে এসেছ, মুখ-হাত ধুয়ে জল খাবে এস।

ক্ষুদিরামের বাড়ী। তিন বছরের গদাই কোলে দু তিনজন মহিলা

ধনী, তুই কামারের বউ হলেও খুব ভাগ্যবতী, তুই তো একে পৃথিবীতে আসতে সাহায্য করলি

দিদি, ছেলে আমাদের কেষ্ট ঠাকুর

ক্ষুদিরামের সঙ্গে গদাই

গদাই তোমায় রামায়ণের গল্প বলেছিলাম, মনে আছে?

হ্যাঁ বাবা বল- খুব

কি অদ্ভুত স্মৃতিশক্তি

গদাই সব হুবহু বলে গেল

জানিস, ঘটা-আমাদের গদাই, আমাদের গদাই আজ থেকে পাঠশালায় যাবে

কাল তার হাতে খড়ি হয়ে গেছে

পাঠশালায় গদাই। অল্প পড়তে ও লিখতে শিখেছে

গদাই লিখছে; কিন্তু লেখাগুলি তার কাছে ধাঁধাঁ লাগছে, মাথা ঝন-ঝন করছে

৬

(ক্রমশঃ)

পাঠশালা থেকে ফিরে গদাই। গাছ থেকে পেয়ারা খাচ্ছে।
গদাই, আর খেওনা বাবা
কেন মা?
আমি বারণ করছি না!
কেন বারণ করছ মা?
দেখেছ, ছেলে কি জেদী!
ভয় দেখিয়ে কিছু করতে পারবে না। না বোঝালে বশ করতে পারবে না।
গদাই, চান করতে যাবি?
বাইরে থেকে
যাব
মা, যাচ্ছি চান করতে
মেয়েদের ঘাটে। গদাই আর সব ছেলেরা—
যাঃ, পালা মেয়েদের ঘাটে ছেলেরা কেন

মেয়েদের ঘাটে ছেলেরা থাকলে ক্ষতি কি?

মেয়েদের চান করা দেখলে খারাপ হয়।

দুদিন বাদে

আমি দুদিন ঝোপ থেকে তোমাদের চান করা দেখেছি। আমার তো কিছু হয়নি

দুষ্টু ছেলে তোমার মাকে বলছি।

গদাই, তুমি পুকুরে মেয়েদের চান করা দেখো না, মেয়েরা আমার মত। এতে আমাকে অপমান করা হয়।

সব মেয়েরাই তাহলে মা। আর দেখব না।

কি সুন্দর!

গদাই-এর বয়স ছয়। একদিন গদাই টেকোতে মুড়ি নিয়ে খেতে খেতে মাঠ দিয়ে যাচ্ছে। আকাশে মেঘের অপূর্ব দৃশ্য। মধ্য দিয়ে বক উড়ে যাচ্ছে। গদাই তা তন্ময় হয়ে দেখছে। হঠাৎ— ৮

আরে গদাই-এর কি হল? চল দেখি

গদাই অজ্ঞান হয়ে পড়ে

(ক্রমশঃ)

গদাই, এখন কেমন আছ?
ছেলেটার মাথা এখন ঠিক হলে হয়
মা, আমার কিছু হয়নি। খুব আনন্দে বক উড়ে যাওয়া দেখছিলুম।

এক বছর পর। দুর্গাপূজার সময়
বিজয়া হয়ে গেল, উনি মেদিনীপুরে গেছেন। কবে আসবেন জানিনা।
মা বাবা কবে আসবে?

এমন সময় –
বাড়ীতে কে আছেন?
কে!

আমি মেদিনীপুর থেকে আসছি
ঠাকুর মশায়....?

তিনি....নেই।

চন্দ্রমণি মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেলেন
মা–মা, চোখ চাও মা উঠ মা।

ক্ষুদিরামের মৃত্যুতে শোকসন্তপ্ত চন্দ্রমণিকে ঘিরে পাড়ার প্রতিবেশিনীরা

কি আর করবে বল। ভগবান দিয়েছেন, তিনিই নিয়েছেন।

তোমার গদাইকে আর সর্বমঙ্গলাকে মানুষ করার কথা ভাব

কিছুদিন পরে চন্দ্রমণির বড় ছেলে রামকুমার মাকে বলছে। পাশে রামেশ্বর

মা, গদাই অজ্ঞান হয়ে যাবার পর আর পাঠশালায় যাচ্ছে না

থাক বাবা ওকে জোর করো না। ভগবান যা করেন।

রামেশ্বর, গদাইকে দেখিস।

পিতার মৃত্যুর পর গদাই চিন্তাশীল হয়ে পড়ে। যা দেখে বা শোনে তার কি কারন চিন্তা করে

একদিন টোলের সামনে দাঁড়িয়ে ছাত্রদের পাঠ শুনছে

কেন এত কষ্ট করে পড়ছে? কি হয় পড়ে? বুঝেছি, পুজো করে দক্ষিণা ও চালকলা নেওয়ার জন্য।

১০

(ক্রমশঃ)

শ্মশানে মড়া পোড়ান দেখছে গদাই-

কেন শরীরটা পোড়াচ্ছে। বুঝেছি, ওটা আসল নয়। ওর ভিতরের জিনিসটাই আসল।

কামারপুকুরের পাশ দিয়ে পথ ধরে তখনকার দিনে সাধু-সন্তরা পুরীধামে যেত। কামারপুকুরের অতিথি শালায় তারা বিশ্রাম করতো। গদাই সেখানে প্রায়ই যাওয়া আসা করতো

গদাই তাদের কাজকর্মে নানাভাবে সাহায্য করতো

তুমি আচ্ছা লেড়কা আচ্ছা বক্ত আচ্ছা লক্ষণ

তুমি সাধু হয়েছ কেন?

ভগবান কো সাথ মিলনেকো লিয়ে

আর একজন সাধুকে জিজ্ঞাসা করছে

তুমি ফকির হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছ কেন?

এই বেশে না ঘুরলে ভিখ মেলে না

বুঝেছি অনেকে পেটের জন্যে সাধু হয়

পথে যেতে ধনী কামারনীর বাড়ীর সামনে গদাই

ও গদাই ঠাকুর কোথায় যাচ্ছ?

মাঠে খেলতে যাচ্ছি।

সবাই পেটের জন্যে খাটছে, শুধু দু-এক জনই তা করে না।

আমার তৈরী ননীটা খেয়ে যাও

দাও মা বন্ধুদের সঙ্গে ভাগ করে খাব

এবার তোমার পৈতা হবে, আমার কাছ থেকে প্রথম ভিক্ষা নিতে হবে।

নেব-

মাঠে-

আয়, এটা আমরা ভাগ করে খাই

গদাই, ঐ জঙ্গলের মধ্যে বুধির খালের শ্মশান। তুই শ্মশানে যেতে পারবি?

কেন পারব না এই দ্যাখ যাচ্ছি...

গদাই চলল শ্মশানের দিকে

গদাইয়ের সাহস দ্যাখ! এবার ওকে ডাক।

(ক্রমশঃ)

কি রে ভয় পেলি নাকি?
একলা ঐ শ্মশানে তোর ভয় করলো না!
একলা শ্মশানে ঘুরতে আমার ভাল লাগে।

গদাই তুই ভূত দেখেছিস?
হ্যাঁ, তবে আমার ভয় করে না

আমি রাজি
কিন্তু যাত্রার কোন কথা তো আমার মনে নেই
গদাই আমরা সেই রামলীলার অভিনয়টা আবার করবো

আমার সব মনে আছে
উঃ তুই কি মনে রাখতে পারিস

গদাই মাঝে মাঝে কুমোর পাড়ায় গিয়ে পুতুল গড়া দেখে, পটোদের কাছে আঁকা শেখে একদিন গদাইও এক হাতে একটা তুলি ও অন্য হাতে একটা পুতুল নিয়ে বসে যায়

কুমোর দাদা, তোমাদের মূর্তিতে দেবতাদের চোখের টান ঠিক হয়না। এই দেখ
বাঃ, খুব ভাল হয়েছে। তুমি কি করে জানলে?
আমি যে দেখতে পাই

একদিন প্রসন্ন দেবীর সঙ্গে কতকগুলি মহিলা যাচ্ছে। এমন সময় গদাই—

দিদি, তোমরা কোথায় যাচ্ছ?

বিশালাক্ষীর মন্দিরে

আমিও যাব

গদাই তাদের সঙ্গে চলল

বিশালাক্ষ্মী খুব জাগ্রত দেবতা

হ্যাঁ ঠিক বলেছিস

পথে গদাইয়ের মানস চোক্ষে দেবী হাসছেন

খানিক অগ্রসর হবার পর—

গদাই আসছে তো?

ওমা! গদাই অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে।

এর কি হলো! হে মা বাসুলী ভাল করে দাও

আমার মনে হয়, এর উপর বিশালাক্ষীর ভর হয়েছে

তখনও গদাইয়ের মানস চোখে মনসা দৃশ্যমান রয়েছে

হে মা বিশালাক্ষী চোখ চাও, চোখ চাও

(ক্রমশঃ)

গদাইয়ের মানস দৃষ্টি হতে মনসা ক্রমশ অদৃশ্য হল
এই তো গদাইয়ের জ্ঞান ফিরে আসছে
ওরে আমাদের কষ্ট করে মন্দিরে যাবার দরকার নেই, গদাইকে পুজো করে একেই নৈবেদ্য দে
গদাই নয় বৎসরে পড়ল একদিন রামকুমার তার মা-কে বলছে—
ব্যবস্থা কর বাবা
মা, গদাইয়ের তো উপনয়নের সময় হল
এ কথা কানে যেতে গদাই বলল—
ধনীদিদি আমার প্রথম ভিক্ষে হবে মা
আমি যে তাকে কথা দিয়েছি
এ কাজ করলে জাতে পতিত হব
লোকে নিন্দে করবে যে।
নিন্দের ভয়ে সত্য পালন করবো না!
গ্রামস্থ সকলেই গদাইয়ের কাছে পরাভূত হলে। গদাই ধনী-কামারনীর হাত থেকে নিল প্রথম ভিক্ষা

একদিন

গদাই আমি বুড়ো হয়েছি তুমি রঘুবীরের পূজার ভার নাও

নেবো মা

পূজো করছে গদাই। সামনে রঘুবীর শীলা। ধ্যানে মগ্ন গদাই

ঠাকুর তুমি তো শুধু শীলা নও। তোমার আসল রূপ দেখাও।

তার অন্তর থেকে শিলার অন্তর্ধান হয়ে পূর্ণ জ্যোতিতে আবির্ভূত হল রঘুবীর—

শিবরাত্রির দিন সন্ধ্যে বেলা। সব পূজো সেরেছে। এমন সময়—

গদাই...

কি রে?

যাত্রা দলে শিব সাজে যে ছেলেটি, তার অসুখ। তোকে শিব সাজতে হবে

যাও বাবা, লোকে আনন্দ পাবে

যাত্রার আসরে শিব-বেশী গদাইয়ের আবির্ভাব।

আহা!

অহোঃ কি অপূর্ব

ওঃ, এ যে সাক্ষাৎ শিব!

১৬

(ক্রমশঃ)

আসরে এসে শিব বেশী গদাই ক্রমশ- নির্বাক নিশ্চল হয়ে যায়। প্রম্পটার তাকে পার্ট বলাতে চেষ্টা করতে থাকে। গদাইয়ের এই কান্ড দেখে সব হতবাক হয়ে যায়

এই শিব, পার্ট বল;-"এই বিশ্ব মাঝে আছে কোন জনে---" কি হল?

অধিকারী মশাই গদাই কোন কথা বলছেনা কেন?

?!

ভয়ে মূর্চ্ছা যায়নি তো?

কি হলো, চুপ মেরে গেলে কেন বাবা!

ও ভয় পেয়েছে বোধ হয়

অচেতন গদাইকে সকলে বাড়ি পৌঁছে দেয়

গদাই! গদাই!

কি মা?

ও রামকুমার- গদাইয়ের জ্ঞান হয়েছে

আমার কিছু হয়নি মা -শিবঠাকুর দেখেছিলুম।

গদাই-এর বাড়ির কাছেই পাইনদের বাড়ি সেরা দু ভাই— সীতানাথ ও দুর্গাদাস পাইন গদাই প্রায়ই সীতানাথ পাইনের বাড়ি যেত। একদিন—
আরে, গদাই যে! এতদিন আসনি কেন? বাড়ির লোকেরা তোমার খোঁজ করছিল।
পাশের বাড়ি থেকে দুর্গাদাস গদাইকে বাড়ির ভিতরে ঢুকতে দেখে দাদার কাছে এসে বলল—
দাদা, কাজটা ভাল করছো না।
কোন কাজটা?
গদাই-র বয়স হয়েছে, তাই হুট্ করে বাড়ির মধ্যে যেতে দেওয়া
মেয়েদের কড়া পর্দায় রাখতে হয়। আমার বাড়িতে কেউ ঢুকুক তো দেখি!
তোমার কি মত শুনি?
শুনতে পেয়ে গদাই বলল—
অতি দর্প ভাল নয়। বেশী দর্প করলেই চূর্ণ হবে
১৪
তোমার দর্পহারীকে পাঠিয়ে দিও। উচিত শিক্ষা দিয়ে দেব।

(ক্রমশঃ

দুদিন বাদে সন্ধ্যে বেলা। দুর্গাদাসের বাড়ি

কে গা তুমি?

হাটে চুপড়ী বেচে ফিরতে দেরি হয়ে গেছে। গাঁয়ে ফিরতে রাত হয়ে যাবে। ভয় করছে!

আমার কাছে কি চাই ?

আজ রাতের মত যদি আশ্রয় দেন.

যাও, ভিতরে যাও!

বাড়ির ভিতরে

কত দূর থেকে এসেছ, একটু জল খাও।

দাও দিদি

ঘন্টা খানেক বাদে বাইরে রামেশ্বরের গলা—

গদাই-গদাই-!

!?

ডাকটা গদাই-এর কানে গেল-

যাইগো, দাদা!

পরচুলা হাতে নিয়ে গদাই ছুটল বাইরে-

দপদপ্।

গদাই কোথায় যাচ্ছিস ?

যাদের অধিকারীর কাছে এসব ফেরৎ দিতে।

ক্ষুদিরামের বাড়ীতে-
মা, এখন আমাদের সংসার বাড়ছে। আর তো চালানো যাচ্ছে না।
ভগবান অদৃষ্টে যা লিখেছে, তাই তো হবে, রামকুমার

আমি ভাবছি কলকাতায় যাব, আমার ছেলে অক্ষয় তোমার কাছে থাকবে, রামেশ্বর তোমাদের দেখাশোনা করবে।
যা ভাল বোঝ কর
আচ্ছা, রামেশ্বরকে ডাকি

আমাকে ডাকছিলে দাদা?
হ্যাঁ, আমি কলকতায় যাচ্ছি, তুমি এদের দেখো।

কিছুদিন পর। গদাই পথ দিয়ে যাচ্ছিল। এমন সময়
সুড়ী বাড়িতে ঝগড়া হচ্ছে!

আমার এদিকে এলে মাথা ভেঙ্গে দেবে!
এদিকটা আমার। এদিকে এলে তোর ঠ্যাং ভেঙ্গে দেব!
২০

একটা জমি নিয়ে মধু সুড়ী আর যদু সুড়ীর মধ্যে ঝগড়া হচ্ছে। মাঝখানে একটা দড়ি লম্বা করে ফেলে রেখেছে।

এই রকম মারামারি করে কেউ কি আনন্দে থাকতে পারে?

[ক্রমশঃ]

একমাস পরে মধু সুড়ীর বাড়ী থেকে উঠল কান্নার রোল।

ঐ তো সেদিন জমি নিয়ে মারামারি হল, আর আজ! জমি তো সঙ্গে যায় না। তবু এরা বোঝে না!

ফেরার পথে দেখল এক ব্রাহ্মণ নৈবেদ্য নিয়ে ফিরছে।

এ সমস্ত হল পেটের জন্যে.

রঘুবীরের আরাধনায় গদাই

ঠাকুর তোমাকে দেখলে কত আনন্দ, লোকে তা বোঝে না কেন?

কর্মফল।

কলকাতায় ঝামাপুকুরে রামকুমার টোল খুলেছে

আজ পাঠ শেষ। তোমরা কাল পাঠ-অভ্যাস করে আসবে

এখানে কাজ বাড়ছে গদাইকে আনলে হয়

আমি একলা পেরে উঠছি না। তুই এখানে যজমানের বাড়ী পুজো করবি।

গদাই এলো কলকাতায়

কলকাতায় এসে গদাই যজমানের বাড়ি পুজো করছে

পুজোর শেষে গদাই গান গাইছে—
আর কবে দেখা দিবি মা...
আর একটা গান গাও

আরে, দ্যাখ পাগলা পুজোর ফল নিয়ে চলেছে!
এই পাগল ওগুলো আমাদের দাও
এসো তোমরা নাও।
ছেলেরা পথে ঘিরে ধরেছে গদাইকে

অনেকদিন হল, কলকাতায় এসেছিস। একদিনও তো টোলে বসলি না!
কি হবে বসে?

বামুনের ছেলে শাস্ত্র পড়বি, জ্ঞান হবে, পুজোপাঠ আর বিধান দিয়ে সংসার চালাবি।
ও তো, চালকলা বাঁধা বিদ্যে। ও আমি শিখতে চাইনা

অ্যাঁ! তাহলে কি করবি?

আমি এমন বিদ্যে শিখতে চাই যাতে লোকে আনন্দে থাকে

২২

[ক্রমশঃ]

নাঃ তোর মাথাটা সত্যিই খারাপ হয়েছে। সাধে কি লোকে পাগলা গদাই বলে ক্ষেপায়!

আমার তো অতে রাগ হয় না

একদিন এক অচেনা ব্যক্তি রামকুমারের কাছে এলো

আপনাকে তো ঠিক চিনতে পারছি না!

আমি রানী রাসমনির জামাতা মথুর বাবুর কাছ থেকে আসছি

আপনার সব কথা শুনলুম। দক্ষিণেশ্বরে মন্দিরে প্রতিষ্ঠার পরই চলে আসব।

আপনার ইচ্ছে

দক্ষিণেশ্বরে মন্দির প্রতিষ্ঠার উৎসব। সেই উৎসবে ঠাকুর বেড়াচ্ছেন আর ভাবছেন—

দাদা, কৈবর্তের মন্দিরে শুধু পূজো করা নয়, প্রসাদ অবধি গ্রহণ করলেন!

সন্ধ্যে হতে চলল এইবার কলকাতায় পালাই!

গদাই কলকাতায় ফিরে। দিগম্বর মিত্রর মিত্রের বাড়ি থেকে নৈবেদ্য নিয়ে ফেরার পথে ছেলেরা নৈবেদ্য তুলে নিচ্ছে। কিন্তু গদাইয়ের হুস নেই...

দাদা তো এখনোও এলো না! আজ দেখতে যাব

আবার গদাই এলো দক্ষিণেশ্বরে —

গদাই এসেছিস, বাঁচালি বাবা। এদের পেড়াপিড়ীতে এখানেই পাকাপাকি হয়ে গেলাম

দাদা, বাবা হলে কখনও নিম্ন জাতির অন্ন গ্রহণ করতে না

দেবতার প্রসাদ কখনও অশুদ্ধ হয়?

তা জানি না। কিন্তু বাবাকে কখনও করতে দেখিনি

তবে আয় আমার সঙ্গে

রামকুমার গদাইকে নিয়ে মন্দিরে ভবতারিনীর সামনে এসে উপস্থিত হল

মা, তোমার প্রসাদী অন্ন গ্রহণে পাপ হয়ে থাকলে এই যে পুষ্প তোমার পায়ে রাখলুম তা পড়ে যাবে।

২৪

দেখ-দেখ-গদাই, মা, পা-দিয়ে ফুল ধরে রেখেছেন

তাই তো!

[ক্রমশঃ

মা-র পা-থেকে যখন ফুলটা পড়লো না, এতে প্রমাণ হল যে, আর আমাদের প্রসাদ গ্রহণে বাধা নেই

এরপর থেকে গদাই দক্ষিণেশ্বরে রয়ে গেল—

কয়েক দিন পর ঠাকুরের ভাগ্নে হৃদয় এসে হাজির

মামা, আমি, এসেছি এখানে থাকব

আরে! হৃদে এসেছিস?

খুব ভাল করেছিস। দাদাকে বল

সেই থেকে ঠাকুরের কাছেই হৃদয় থেকে গেল

একদিন হাতে তৈরী একটা শিবমূর্তির সামনে ধ্যানে মগ্ন গদাই। পিছনে মথুর বাবু ও হৃদয়

হৃদয় এ মূর্তিটা খুব সুন্দর। কে করেছে?

ঠাকুর।

যতদিন যাচ্ছে, ছোট ঠাকুরের গুণ ততই প্রকাশ পাচ্ছে!

পুজোর পর ঠাকুরের তৈরী মূর্তিটা দেবে।

মামাকে বলব।

একদিন মথুর বাবুকে দক্ষিণেশ্বরের বাগানে আসতে দেখে ঠাকুর

মামা তুমি বাবুকে দেখে পালাচ্ছ কেন?

এখুনি আমায় চাকরী করতে বলবে!

এ তো সুখের কথা!

তুই সুখ করগে যা, আমার ভাল লাগে না

ঐ দ্যাখ, দ্বারবান আসছে, আমি পালাই। বলবে বাবু ডাকছে!

না, তোমাকে পালাতে দেব না, তোমাকে যেতে হবে বাবুর কাছে

তুই যদি আমার সহায় থাকিস, াহলে াব।

সেলাম ঠাকুর মোশয়, রাজা বাবুর তলব

চল মামা, আমি তোমাকে সাহায্য করব।

[ক্রমশঃ]

দেখলি হৃদে। গেলেই চাকরী নিতে বলবে।
ভয় কি মামা আমি তো আছি
দক্ষিণেশ্বরে মথুরের বৈঠকখানা বাড়ি। গদাধর সঙ্গে হৃদয়—
এসো ছোট ঠাকুর। এসো হৃদয়।
আপনি মামাকে ডাকছিলেন?
তোমার বড় মামার কাছে শুনেছি, ছোট ঠাকুর চাকরী করতে অরাজী। কেন বলতো?
তা জানি না— মামা বলবে।
পেটের জন্যে দাসত্ব করবার ইচ্ছে নেই।
পেটের জন্য করবার কি দরকার। ঠাকুরের সেবা করা কি পেটের জন্য করা? তুমি মা ভবতারিনীকে সাজাবার ভার নাও।
আমি কিন্তু গয়নাগাটির হিসাব রাখতে পারবো না। হৃদে যদি সাহায্য করে তবে, ভার নিতে পারি
নিশ্চয় নেবে। আজ থেকে হৃদে তোমার সহকারী হল।
একদিন রাত ৮/৯ সময় একজন লোককে রাধাকান্তের মন্দির থেকে দৌড়ে আসতে দেখা গেল—
সরকার মশাই— সরকার মশাই, সর্বনাশ হয়েছে!

রাধাকান্তের পূজারী মশাই পড়ে গেছেন। গোবিন্দজীকে শয়ণ করাতে নিয়ে যাচ্ছিলেন। গোবিন্দজীর পা ভেঙে গেছে!

সর্বনাশ! রানীমা শুনলে কি বলবেন এখন বাবুকে জানাতে হবে।

কলকাতায় রানী রাসমনির বাড়ি -

মা! দক্ষিণেশ্বর থেকে চিঠি এসেছে। পূজারীর অসাবধানতায় গোবিন্দজীর পা ভেঙে গেছে!

এত অশুভ লক্ষণ! তুমি পণ্ডিতদের কাছে বিধান নাও।

কয়েক দিন পর-

পণ্ডিতেরা বলছেন ভাঙা ঠাকুরের পূজো হয় না। কিন্তু ছোট ঠাকুর বললেন—

কি বললেন?

মথুর ও গদাধর

ছোট ঠাকুর তোমার কি মত? ভাঙা গোবিন্দজী কি ফেলে দেওয়া হবে?

রানীমার জামাইয়ের পা ভাঙলে তাকে ত্যাগ করে নতুন জামাই আনবেন, না ঐ পা সারিয়ে নেবেন?

অ্যাঁ! ছোট ঠাকুর বলেছেন। বাঃ, সুন্দর কথা তো! ওকেই রাধাকান্তর পূজারী কর।

রাধাকান্তর পূজারী বরখাস্ত হলেন। গদাধর রাধাকান্তর পূজাদি করতে লাগলেন। রামকুমার গদাধরকে শক্তি পূজার নিয়ম কানুন শেখাতে লাগলেন। অল্পদিনেই গদাধর তাতে পারদর্শী হয়ে উঠে এবং

শক্তি মতে দীক্ষিত হল গদাধর—

২৮

(ক্রমশঃ)

ক্রমশ: রামকুমারের শরীর খারাপ হওয়ায় পরিশ্রমের কাজ আর পেরে উঠছিলেন না। একদিন মথুরবাবুকে বললেন

গদাই এখন ভবতারিনীর পুজো করতে পারবে। ওকে ঐ ভার দিন রাধাকান্তর কাজগুলো আমি করবো

বেশ তো, আমার আপত্তি নেই

গদাধর যখন তন্ময় হয়ে পুজো করে, ভবতারিণীর ঘর তখন পবিত্র আবহাওয়ায় পূর্ণ হয়ে উঠে

দর্শকরা বলছে

ছোট ঠাকুর যখন পুজো করে কোন হুঁস থাকে না

ঘরটা কেমন যেন গম গম করে। কিসের যেন আবির্ভাব হয়েছে!

হ্যাঁগো, মামাকে দেখেছ? পুজোর পর কোথায় গেল?

না তো!

মাঝে মাঝে মামা কোথায় অদৃশ্য হয়ে যায়। জিজ্ঞেস করলে কিছু বলে না। দেখতে হবে।

একবছর কেটে গেল। একদিন রামকুমার গদাধরকে বললেন—

গদাই, আমি দু-তিন দিনের জন্য কামারহাটি যাচ্ছি। সেখান থেকে দেশে যাব। সাবধানে থাকিস যেন।

আচ্ছা দাদা

দুদিন পর সকালে এক-অচেনা লোক দক্ষিণেশ্বরে এলো—

এখানে গদাধর ঠাকুর থাকেন?

হ্যাঁ, ভেতরে আছেন

আমি কামারহাটি থেকে আসছি।

দাদার কথা কিছু জানেন?

হ্যাঁ, তিনি স্বর্গে গেছেন

অল্প বয়সে বাবাকে হারিয়েছি। আজ দাদাকে হারালুম। সংসারে তাহলে কেউ থাকে না

এই ঘটনার পর গদাধর মনপ্রাণ সব ভবতারিনীর পূজায় ঢেলে দিলেন। সব সময়ে মাকে বলেন—

মা, এই সংসারে কেউ থাকে না। পণ্ডিতেরা বলেন, তুমিই এই সংসার করেছ, তুমি যদি থাক তো দেখা দাও।

রাতের গভীরে গদাধর সকলের অজ্ঞাতে পঞ্চবটির জঙ্গলে ধ্যান করতে যান। একদিন—

রোজ রাত্রে মামা বেরিয়ে যায়। আজ দেখব কি করে।

একি! মামা গাছের ডালে কাপড়-পৈতে রেখে বিবসন হয়ে ধ্যান করছে! মামার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে?

৩০

দেখি ভয় দেখিয়ে

(ক্রমশঃ)

এত ঢিল ছুড়লুম তবু কোন ভয় নেই! আজ বাড়ি ফিরুক জিজ্ঞেস করবো

হ্যাঁ মামা, তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে? এই রাতের অন্ধকারে কাপড়-পৈতে খুলে জঙ্গলে বসেছিলে কেন?

তুই মুখ্যু, তুই কি বুঝবি। পাশমুক্ত হয়ে ঈশ্বরকে ডাকতে হয়।

সে আবার কি?

তোকে যদি এখানে বেঁধে রাখি, তাহলে ইচ্ছে হলে তুই কি দেশে যেতে পারবি?

তা আবার হয় না কি?

মানুষের মনটাও অদৃশ্য দড়িতে বাঁধা থাকে। তাকে ঈশ্বরের কথা ভাবতে দেয় না। সেই রকম বাঁধনের নাম পাশ।

মামা, এইবার ঠিক বুঝেছি - তোমার মাথা খারাপ হয়েছে! পাশ-ফাঁস কি সব বলছ

পাশ-ফাঁস নয় - অষ্টপাশ।। মন থেকে এদের তাড়াতে হয়। এরা হল, লজ্জা ঘৃণা-ভয়-জাতি-কুল-শীল-মান অভিমান-

তাই বুঝি তুমি লজ্জা তাড়াতে বিবসন হও। তা পৈতেটা কি দোষ করলে?

আমি ব্রাহ্মণ - বর্ণগুরু এই অভিমান আসে। আজ থাক। কাল সকালে আবার উঠতে হবে।

দিন কয়েক পর হৃদয় দেখল—
আরে! মামা ভিখারীদের উচ্ছিষ্ট পাতাগুলো নিয়ে নিজে ফেলতে যাচ্ছে!
মামা আঁস্তাকুড় পরিষ্কার করছে নিজে হাতে!

আর একদিন গদাধর এক হাতে টাকা অন্য হাতে মাটি নিয়ে বলছে—
টাকা মাটি, মাটি টাকা, টাকা মাটি.....
এ আবার কি!
?!
মাটি টাকা—
তারপর দুই-ই জলে ফেলে দিল

এসব কি সুস্থ মস্তিষ্কের কাজ? মামাকে জিজ্ঞেস করলে বলবে মুখ্যু।
জগৎ তারিনীর পুজো করছে গদাধর। ভাবে তন্ময়—
মা, তোর জন্য সব ত্যাগ করলুম তবু দেখা দিবি না—

মা-যদি দেখা না দিস, তবে এই খাঁড়া দিয়ে আজ মরব।

এমন সময় ঘরটা জ্যোতিতে ভরে গেল

গদাধর সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে যায়

ঠাকুর মশাই অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন!

এই ঘটনার পর কয়েকদিন সদাই ঈশ্বর-চিন্তায় মগ্ন হয়ে রইল গদাধর। হৃদয় মন্দিরের কাজ কর্ম অন্য ব্রাহ্মণের সাহায্যে চালাতে লাগল

গদাধরের মানস নেত্রে মা জগদম্বা

মা, মা, আমায় ত্যাগ করিসনি —

কিছু দিন পর গদাধর প্রকৃতিস্থ হলেন এ আবার পূজো-পাঠ করতে শুরু করেন

গদাধরের পুজো করার নির্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হয়ে বহুক্ষণ কেটে যায়। তাই মন্দিরের কর্মচারীদের মধ্যে কানাকানি হতে থাকে

ছোট ঠাকুরের জ্ঞান হবার পর পাগল হল না কি? কতক্ষণ পুজোয় আটকে আছে!

পুজো করার ধরন ও পাল্টে গেছে!

প্রতিমার নাকের কাছে তুলো ধরে দেখছে নিঃশ্বাস পড়ছে কিনা। গদাধরের চোখে তুলো নড়ছে নিঃশ্বাসের জোরে

মা গো, তোমার কি দয়া, তুমি এই মৃন্ময় প্রতিমায় এসেছো

এইরে! পাগলা বামুনটা আবার ক্ষেপে গেছে। অনাচারে সব নষ্ট করে দিলে।

পঞ্চবটী তলা দিয়ে যেতে যেতে ভাবছে ঠাকুর

এখানে তুলসী গাছের বেড়া দিয়ে ঝোপ করলে বেশ হয়।

মালী, এখানে তুলসী গাছের বেড়া দিতে পার?

ব্যাকারি কাটারি ও দড়ি পেলে বেড়া করে দিতে পারি

দুদিন পর দড়ি কাটারি ও ব্যাকারির একটা বান্ডিল ভেসে এলো গঙ্গার জলে

৩৪

ঠাকুর মশায়, ব্যাকারি-দড়ি-কাটারী জলে ভেসে এসেছে!

গদাধরের খেয়ালীপনা পুজো দেখে হৃদয়ের ভয়

মামাকে সাবধান করতে হবে। এ সব মথুর বাবু জানলে ক্ষতি হবে

মামা, তোমায় একটা কথা বলব। তুমি পুজোর সব নৈবেদ্য বেড়ালকে খাওয়াচ্ছ। পুজোর আগেই ভোগ দিচ্ছ— বাবু শুনলে রাগ করবে

আমি কি ইচ্ছে করে কিছু করি, কে যেন জোর করে করায়

গদাধরের নিয়মবহির্ভূত পুজো দেখে মন্দিরের কর্মচারীরা মথুরকে জানায়

রাজাবাবু—
এখানে ছোট ঠাকুর অর্ধোন্মাদ হয়ে গেছেন। যা তা করে পুজো করেন এভাবে পুজো করায় ফলে ক্ষতি হতে পারে।
ইতি—
কর্মচারীবৃন্দ
(দক্ষিণেশ্বর)

মথুরবাবু নিজে দেখতে এলেন দক্ষিণেশ্বরে। গদাধর পুজো করছে বাহ্যজ্ঞান শূন্য —

কোন হিসাবে হর হৃদে…

এইভাবে তন্ময় হয়ে দেবতার সঙ্গে ব্যবহার করতে তো কাউকে দেখিনি!

এই রকম ভক্ত পূজারীর পুজোয় মা নিশ্চয় জেগে উঠবেন।

সরকার মশাই, ছোট ঠাকুর তার খুশী মত পুজো করবেন তাকে বিরক্ত করবেন না

সদাই জগদম্বার ভাবে বিভোর গদাধর আত্মভোলার মত আচরণ করেন। তা দেখে মন্দিরের কর্মচারীরা—

দেখ, দেখ, ছোট ঠাকুর পাগল হয়ে গেছেন। পুজোর নৈবেদ্য বেড়ালকে খাওয়াচ্ছে

চাঁদনীতে পড়ে গদাধর মুখ ঘসছে

মা-মা দেখা দে...

আহা, বেচারার শূল বেদনা হয়েছে

গদাই তুই হৃদয়কে পুজোর ভার দে

গদাধর পুজো
নেত্রে মা জগদ

মা বলেছে আমার জায়গায় হৃদয় পুজো করবে

ছোট ঠাকুরের যা অবস্থা—মনে হয়, তিনি আর নিয়মমত পুজো করতে পারবেন না

ঘরে ফিরে মথুরবাবু দেখেন—

কে আপনি ?

আমার নাম রামতারক চট্টোপাধ্যায়, গদাধরের খুড়তুতো ভাই। লোকে হলধারী বলে। কাজের জন্য এসেছি।

আপনি জগৎতারিনীর পুজোর ভার নিতে পারবেন ?

পারবো

এদিকে গদাধর যেতে যেতে ভাবছে

আমার যদি সিদ্ধি হয়ে থাকে, তবে ঐ পাথরটা লাফাবে

৩৬

[ক্রমশঃ]

গদাধর ইচ্ছা প্রকাশ করতেই পাথরটা লাফাতে থাকে —
থাক-থাক
রানী রাসমনি এসেছেন দক্ষিণেশ্বরে। গদাধরের গান শুনছেন —
কেমন হিসাবে হর হৃদে…
রাজসাহী জমিদারীর মামলাটা কি ভাবে জেতা যায় —
হঠাৎ গান থামিয়ে রানী-মাকে আঘাত করে বসলেন গদাধর
এখানে বসেও বিষয়ের চিন্তা!
ওগো, তোমরা তাড়াতাড়ি এসো, ছোট ঠাকুর রানীমাকে মারছে
তোমরা ছোট ঠাকুরকে কিছু বলবে না, ওনার কোন দোষ হয় নি
দাসীর চিৎকারে ছুটে এলো সব দারোয়ান চাকরেরা —
মা, ছোট ঠাকুরের মাথা খারাপ হয়ে গেছে
মথুর, ছোট ঠাকুর কি করে আমার মনের কথা বুঝলেন!

মা, ছোট ঠাকুরের এক একটা কাজ অলৌকিক মনে হয়। তবুও আত্মহারা হওয়াটা–
কয়েকদিন পরে
ঠাকুর মশাই, লোকে তোমাকে যাতা বলে আমার এতে কষ্ট হয়। একটু সামলে চলতে পারনা?
ইচ্ছে তো হয় কিন্তু কে যেন আমাকে জোর করে চালায়
জগতে সকলকে নিয়মে চলতে হয়। যিনি জগৎ সৃষ্টি করেছেন নিয়ম অতিক্রম করার সাধ্য নেই
সে কি কথা বলছ মথুর! যিনি নিয়ম করেন তিনি নিয়ম পাল্টাতেও পারেন
তাহলে তিনি কি লাল ফুলের গাছে সাদা ফুল ফোটাতে পারেন?
তাঁর ইচ্ছে হলেই হবে
পোস্তার বাগানে ফুল তুলছেন গদাধর–
আরে, ওকি! একটা জবা ফুলের গাছে লাল-সাদা দু'রঙের দু'টো ফুল ফুটেছে।
এই দেখ, মথুর–

কয়েক মাস পর ঠাকুরের মনে উঠল রঘুবীরের চিন্তা—

মা, মা, সীতা দেবীকে একবার দেখা মা।

হনুমান ছিল রাম-সীতার ভক্ত, হনুমানের মত হয়ে ওঁকে ডাকতে হয়।

জয় রাম...

গদাধর কাপড়টা হনুমানের লেজের মত করে জোড় পায়ে লাফিয়ে চলেছে—

রাম...

?!

গাছে উঠে চেঁচাচ্ছে গদাধর—

এবার রাজাবাবু, ছোট-ঠাকুরের পাগলামী নিজের চোখে দেখেছেন

আর বাবুকে ঠকাতে পারবে না

ছোট ঠাকুরের বায়ু বৃদ্ধি হয়েছে, ভাল চিকিৎসার দরকার।

পঞ্চবটী থেকে গদাধর দেখছে—এক রূপসী মহিলা উঠে আসছে গঙ্গা থেকে

জনম দুঃখিনী সীতা!

একদিন মথুরবাবু বসে চিন্তা করছেন। অদূরে ঠাকুর বারান্দায় পায়চারি করছেন হঠাৎ—

ওকি!

ওকি, আমি কি দেখছি !

বারান্দায় পায়চারি করছেন ঠাকুর

মথুরবাবু দেখছেন সাক্ষাৎ মা জগৎতারিণী বারান্দায় পায়চারি করতে করতে একবার ঘুরে যাচ্ছেন, আবার ফিরে যাচ্ছেন সাক্ষাৎ দেবাদিদেব মহাদেবের রূপ ধরে !

ঠাকুর...!

ঘর থেকে ছুটে বের হয় মথুর-

বাবা, এবার তোমায় চিনেছি

একি! একি! রাজাবাবু! লোকে দেখলে কি বলবে?

আমি দেখেছি বাবা, তুমিই শিব; তুমিই কালী; আমার অপরাধ মাপ কর।

চুপ, চুপ, কেউ শুনলে কি মনে করবে। তুমি যা দেখেছ মনেই রেখ

আমায় কখনও ভুলবে না বল—সব সময় আমাকে রক্ষে করবে বল

এখন যাও, এখন যাও। এ-সব কথা আর কাউকে বলো না যেন।

৪০

[ক্রমশঃ

নিরবচ্ছিন্ন আধ্যাত্মিক ভাবে থাকার ফলে ঠাকুরের দেহ সব সময় জ্বালা করত। একদিন ঠাকুর দেখলেন-- তাঁর শরীর থেকে এক মিসকালো অসুরাকৃতি পুরুষ বেরিয়ে এলো

এ কি?!

আমার শরীর থেকে এ কি কুৎসিৎ আকার বেরোল! এই কি পাপ-পুরুষ, মানুষের দেহ অবলম্বন করে থাকে?

পরক্ষণেই গৈরিক বসন পরিহিত এক এক সন্ন্যাসী বেরিয়ে এলো ঠাকুরের দেহ থেকে এবং আক্রমণ করলো সেই পাপ পুরুষকে

হত্যা করলো পাপ পুরুষকে

একি, পাপ পুরুষ নিহত হতে আমার দেহের সমস্ত জ্বালা চলে গেল!

ভাবাবেশে বিভোর গদাধরের আচরণ সাধারণের চোখে পাগলামীর নামান্তর

মা-মা, দেখা দে

খাবি মা, নে-নে—

আহা, ছোট ঠাকুরের মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে।

গদাধরের উন্মাদ হবার খবর কামার-পুকুরে তাঁর মা-র কাছেও পৌঁছে যায়

রামেশ্বর, গদাইকে আমার কাছে নিয়ে আয়

আচ্ছা মা, বাবুকে আমি চিঠি দিচ্ছি

মথুরবাবু—

মথুরবাবু,
আমার ভাই এখন অসুস্থ। তাকে দয়া করে পাঠিয়ে দিলে মা'র মন শান্ত হয়-
প্রণত
রামেশ্বর

বাবা, তোমার দেশ থেকে চিঠি এসেছে। তোমাকে যেতে লিখেছে।

বেশ তো...

মা-মা, দেখা দে...

কামারপুকুরে ফিরে আসে গদাধর। কিন্তু তাঁর সেই পূর্বের উন্মনা ভাবের কোন পরিবর্তন হয় না

মা, লোকে বলছে—গদাইকে ভূতে পেয়েছে। রোজা ডাকলে হয় না?

রামেশ্বর, আমার গদাইয়ের একি হল...?

৪২

গদাধরকে ভূতের হাত থেকে উদ্ধার করতে আসে ওঝা
এই সর্ষে বান মারছি— ভাল চাস তো এই দেহ ত্যাগ করে যা বলচি—
কিন্তু গদাধর নির্বিকার
মা জননী, আপনার ছেলেকে ভূতে পায়নি আপনি চণ্ড নামিয়ে জিজ্ঞেস করুণ
কয়েক দিন পর চণ্ড নামানোর ব্যবস্থা হয়—
ওঁ চণ্ডায় নমঃ... চণ্ড দেব আপনি এসেছেন ?
হ্যাঁ
আপনার পাশে বসা এই ছেলেটির কি রোগ হয়েছে ?
কিছু হয়নি। আধ্যাত্মিক প্রভাবে ঐ ভাবে আছে
গদাই তুমি যদি সাধু হতে চাও তো অত সুপারী খাও কেন? বেশী সুপারী খেলে কামভাব বাড়ে
রামেশ্বর, চণ্ড দেবের কথায় আমার দুশ্চিন্তা দূর হল
হ্যাঁ মা। কিন্তু, গদাই যে এখন প্রায়ই নতুন হাঁড়িতে করে শ্মশানে মিষ্টি নিয়ে যায়।

যাই, এই মিষ্টিগুলো শ্মশানে নিয়ে শিবের অনুচরদের সেবা করে আসি

শিব আর ভূত পরিবেষ্টিত শ্মশানে গদাই

এমন সময়—

গদাই—গদাই

দাদা!

দাদা, তুমি এদিকে এসো না, অপদেবতারা তোমার ক্ষতি করতে পারে

তুই সব সময় শ্মশানে আসিস; ভূতের ভয় নেই তোর?

ওদের সঙ্গে আমার ভাব হয়ে গেছে যে

গদাইয়ের বাড়িতে এখন প্রায় সব সময়ই পাড়ার লোকের ভিড়। গদাই এখন অনেক শান্ত—

ঠিক বলেছিস আমারও

কিন্তু সত্যি বল, গদাই কি সুন্দর কথা বলে। চল, ভিতরে যাই

রোজ ভাবি এখানে আসব না, কিন্তু সকাল হলেই মন টানে

রামেশ্বর, আমার মনে হয়—গদাইয়ের বিয়ে দিলে ওর আর মাথা খারাপ হবে না

তাহলে পাত্রীর খোঁজ নেব মা?

৪৪

[ক্রমশঃ]

যুগে যুগে— (পূর্ব প্রকাশিতের পর) —দিলীপ দাস

মা, এত খুঁজলুম তবুও গদাধরের পাত্রীর সন্ধান পেলুম না

এমন সময় গদাধর বলে উঠে —

জয়রামবাটী যাও, সেখানে পাত্রীর কুটো বাঁধা আছে

যথাসময়ে জয়রামবাটীর রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পঞ্চম বর্ষীয়া কন্যা সারদামণির সঙ্গে গদাধরের বিবাহ হল —

বিবাহের সাত মাস পরে গদাধর দক্ষিণেশ্বরে ফিরে এলো

আবার পূজাপাঠে তন্ময় হয়ে গেল গদাধর, দেহে শুরু হল প্রচন্ড জ্বালা তাই সারা দুপুর গামছা মাথায় আকন্ঠ গঙ্গার জলে বসে থাকত —

একদিন পঞ্চবটীতে

হৃদে আজ রাণীকে সঙ্গে নিয়ে মায়ের অষ্টসখী স্বর্গে গেল

?!

দুদিন পর কলকাতা থেকে একটা চিঠি এলো —

রাণীমা দুদিন আগে সজ্ঞানে কালীঘাটে আদি গঙ্গার তীরে দেহ রেখেছেন

বছর খানের পর একদিন সকালে গদাধর ফুল তুলছে এমন সময় গঙ্গায় অদূরে একটা নৌকা আসতে দেখা গেল

ভৈরবী

নৌকা থেকে নামলেন এক ভৈরবী—

গদাধর তাড়াতাড়ি ঘরে ফেরে

হৃদে, হৃদে কোথায় গেলি

যাই মামা

হৃদে, ঘাটে এক ভৈরবী এসেছে, তুই গিয়ে ওকে ডেকে নিয়ে আয় তো

মেয়েছেলে আমার কথায় আসবে কেন?

তুই গিয়েই দেখ না

আমার মামা আপনাকে ডাকছে!

হ্যাঁ, চল যাই!

বাবা, তুমি এখানে?

তুমি কি আমার কথা জানতে নাকি?

লোকে বলেনি, আমার ইষ্টদেবী আমাকে বলেছেন

তিনজনকে আমার মনের দৃষ্টিতে দেখিয়েছেন। তাঁদের দুজনের সঙ্গে দেখা হয়েছে পূর্ববঙ্গে। তুমি গঙ্গার ধারে আছ জেনে কতদিন ধরে খুঁজছি।

৪৬

[ক্রমশঃ

তোমাদের সাধনায় সাহায্য করার জন্যেই যে আমার আগমন

আচ্ছা বলতে পার, কেন আমার গা সব সময় আগুনের মত জ্বলে?

ও আমি জানি। চৈতন্য দেবের ও হয়েছিল, ওর অসুখ আমার জানা।

তা ছাড়া সব সময় খেতে ইচ্ছে করে

ও আমি সারিয়ে দেব। উচ্চস্তরের সাধকদের ওরকম হয়।

সারিয়ে দাও না

ঠিক আছে, এখুনি ব্যবস্থা করছি। এখানে কেউ আছে?

আপনি কি আমাকে ডাকছিলেন? কি চাই বলুন।

কিছু ফুলের মালা, ধূপ, চন্দনের প্রয়োজন আছে

বাবাকে মালা পরিয়ে-দেহে চন্দন লেপন করে এক জায়গায় বসিয়ে — ধূপ-ধুনা জেলে আবহাওয়া পবিত্র করে তুলতে হবে। এভাবে ক'দিন থাকলেই সব জ্বালা দূর হবে।

সেরে গেলে যত রকম খাবার খেতে ইচ্ছে যায়, সব সামনে থাকবে — খুশি মনে খেও। তাহলে খাবার ইচ্ছেও চলে যাবে

একদিন ভৈরবী তাঁর রান্না করা খাদ্যাদি রঘুবীরের সেবায় নিবেদন করে গভীর ধ্যানে মগ্ন হলেন। এমন সময় ভাবাবিষ্ট গদাধর সেখানে এসে উপস্থিত হলেন এবং

সম্পূর্ণ ভাবাবিষ্ট অবস্থায় ঐ নিবেদিত ভোগ্যদ্রব্য স্বয়ং গ্রহণ করতে লাগলেন—

ধ্যানে ব্রাহ্মণী দেখলেন, স্বয়ং রঘুবীর এসে তাঁর নিবেদিত খাদ্য গ্রহণ করছেন - দেখে ব্রাহ্মণী পুলকিতা হলেন

কিছুক্ষণ পরে ব্রাহ্মণী সংজ্ঞা লাভ করলেন এবং দেখলেন-

নিজ দর্শনের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণভাবে বাহ্যজ্ঞান বিরহিত ঠাকুর তাঁর নিবেদিত ভোগ গ্রহণ করছেন।

তাহলে কি...!

সহসা ঠাকুর সম্বিৎ ফিরে পেলেন এবং নিজ কর্মের জন্য ক্ষুব্ধ ও লজ্জিত হলেন

কে জানে বাবু, আত্মহারা হয়ে কেন এমন কাজ করে বসি!

?!

না বাবা, তুমি কোন অন্যায় করোনি। তোমার ভিতরে যিনি আছেন তিনিই ঐ কাজ করেছেন

৪৮

[ক্রমশঃ]

বুঝেছি, আর আমার পূর্বের বাহ্য পূজার প্রয়োজন নেই। আমার পূজা এতদিনে সার্থক হল

...লে-পূজিত রঘুবীরশিলাটিকে গঙ্গার জলে বিসর্জন দিলেন

একদিন পঞ্চবটীতে গদাধর ও হৃদয় —

জানিস হৃদে— আমার অসুখ সেরে গেছে। ভৈরবী কি বলেছে জানিস

কি মামা?

ভাবে চৈতন্যদেবের শরীরে যে সব লক্ষণ ফুটে উঠত, তা এই শরীরেও ফোটে – এ কথা মথুরকেও বলেছি

বাবু কি বললেন?

ঐ বাবু আসছেন

এই যে মথুর, তোমায় বলেছিলুম না, ভৈরবী একে অবতার বলে

পুরাণে দশটার অধিক তো অবতার নেই বাবা

তুমিও সব কথা ভেবে মন খারাপ করোনা

ঐ যে ভৈরবী আসছে, ওকেই জিজ্ঞেস কর

তুমি আমাকে যা বলেছ এঁকে তা বল তো

আমি জোরের সঙ্গে বলছি, ইনি অবতার। পণ্ডিতদের ডাকুন, আমি শাস্ত্র থেকে প্রমাণ করবো

একদিন ঠাকুর মথুরকে বললেন

মথুর, ভৈরবী যে এটাকে অবতার বলে তার বিচার করালে না?

তাতে যদি তোমার মন স্থির হয়, তাই করবো বাবা

মথুরবাবু আমন্ত্রণ জানালেন বৈষ্ণবচরণকে—

চিঠি

মথুরবাবুর চিঠি?

যথাবিহিত সম্মান পুরঃসর
প্রণামান্তে নিবেদন—
আমাদের দক্ষিণেশ্বরের শ্রদ্ধেয় পুরোহিত
মহাশয় ঈশ্বরভাবে ভাবিত হয়ে সদাসর্বদা
তন্ময় হয়ে থাকেন। সাত্ত্বিকভাবে তাঁর
নানা শারীরিক বিকার হয়। তিনি
অর্থ স্পর্শ করতে পারেন না। তাঁর
এই শারীরিক বিকার সম্বন্ধে নানা-
লোকে নানা মত প্রকাশ করেন
আপনি শাস্ত্রে সুপণ্ডিত। আপনি
কৃপা করে আমাদের শ্রদ্ধেয় পুরো-
হিতকে পরীক্ষা পূর্বক মত প্রকাশ
করলে বাধিত হব। ইতি
মথুর নাথ দাস

যাক, বৈষ্ণবচরণ ও অন্যান্য পণ্ডিতগণ কয়েক দিনের মধ্যেই আসবে লিখেছে

আজ দক্ষিণেশ্বরে বিচার সভা—বৈষ্ণবচরণ ও অন্যান্য পণ্ডিতগণ এসেছেন

আপনি আমার প্রণাম গ্রহণ করুন। কুশলে আছেন তো?

আজ্ঞে

আজ যাঁকে পরীক্ষা করতে এসেছি, তাঁর সঙ্গে আগেই পানিহাটির উৎসবে দেখা হয়েছিল। ওই যে সে আসছে

সভাস্থলে আসছেন ভৈরবী সঙ্গে ঠাকুর

আমি বলছি, ইনি অবতার। এঁর মধ্যে মহাভাবের প্রকাশ পায়

লক্ষণ?

প্রথম লক্ষণ হল—অন্য সব মহাপুরুষদের মত ঈশ্বর আরাধনায় গাত্রদাহ—ফুলচন্দনাদি প্রক্রিয়ায় তা বিদূরিত হয়—দ্বিতীয়ত পুরাণে আছে, শ্রীরাধিকার দেহে যে সব অঙ্গলক্ষণ ভাবাবেশে প্রকাশ পেত, এর দেহাবলম্বনে সেই সব ভাবই দেখা যায়

হ্যাঁগো

সমাধিস্থ হয়ে যায় গদাধর

অ-মশাই! উঠুন না, মূর্চ্ছা গেলেন নাকি?

নাঃ ইনি সত্যই গভীর সমাধিতে মগ্ন—বাহ্য জ্ঞান নেই!

হ্যাঁ, আমি স্বীকার করছি, ইনি অবতার। লোক-কল্যাণে এসেছেন

যাক, বাঁচা গেল। লোকে বলে মাথার ব্যামো, তা আর নয়

না বাবা, তোমার মাথার ব্যারাম হবে কেন?

সেই সময় বাঁকুড়া জেলার ইদেশ গ্রামে গৌরী পন্ডিত বাস করতেন — তিনি ছিলেন তান্ত্রিক সাধক

হা-রে-রে-নিরালম্বো লম্বো-দর-জননী কং যামি শরণম্

কোথাও তর্ক যুদ্ধে আহূত হলে বিকট স্বরে চিৎকার করতে করতে সভায় প্রবেশ করতেন—এতে প্রতিপক্ষের শক্তি হ্রাস পেত আর নিজের শক্তি বাড়াতেন—

হা-রে-রে, নিরালম্বো লম্বোদর জননী কং যামি শরণম্
একি! ঐ বিকট চিৎকার শুনে মনে হচ্ছে আমি সব ভুলে যাচ্ছি
তর্ক সভায় গৌরী পণ্ডিত
তুমি আমার কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলে না
আমি পরাজয় স্বীকার করছি
এ হেন গৌরী পণ্ডিত একবার দক্ষিণেশ্বরে আহূত হলেন—
মন্দিরে এসে তাঁর সেই চিৎকার শুরু করলেন
হা-রে-রে, নিরালম্বো লম্বোদর জননী
ভিতর থেকে ঠাকুরও দ্বিগুণ স্বরে ঐ শ্লোকটি আবৃত্তি করলেন
কং যামি শরণম্—
দুইজনের সেই প্রচন্ড আওয়াজ শুনে ছুটে আসে বাড়ির সব চাকর-বাকর-দারোয়ানেরা—
ওরে ডাকাত পড়েছে মনে হচ্ছে, শিগগীর আয়!
হা-রে-রে-নিরালম্বো লম্বোদর জননী কং যামি শরণম্—
৫২
ওঃ, হাঃ-হাঃ-হাঃ, কিছু নয়, ও আমাদের পুরোহিত আর নতুন পন্ডিতের কাণ্ড!

[ক্রমশঃ]

কোন ক্রমেই ঠাকুরের গলার স্বরকে অতিক্রম না করতে পেরে বিষন্ন মনে মাকে প্রণতি জানায় গৌরী পণ্ডিত–

মা-মা, আজ আমি পরাজিত

সেই থেকে দক্ষিণেশ্বরেই রয়ে গেলেন গৌরী পণ্ডিত এবং পূজা পাঠ যাগ-যজ্ঞ করতে লাগলেন

আমি হোম করবো, কাঠ নিয়ে এসো

এই হস্ত-বেদী থাকাতে মাটির বেদীতে হোম করবো কেন? আমার এই হাতে কাষ্ঠ সাজাও

এই নিন, এক মণ কাঠ!

শুরু হল এক অদ্ভুত হোম–

ওঁ স্বাহা- ওঁ স্বাহা- ওঁ স্বাহা

এ তো সিদ্ধাই।

কিছুদিন গদাইয়ের সঙ্গ করার পর—

গৌরী, বৈষ্ণবচরণ এটাকে অবতার বলে তোমার কি মত ?

আমার ধারণা যাঁর অংশ হতে অবতাররা আসেন আপনি তিনিই, আমি প্রমাণ করতে পারি

তোমরা বড্ড বাড়িয়ে বল

কয়েকদিন বাদে

কি গৌরী, আজ সকালেই যে?

বাড়ি ফিরে যাবার চিঠি আসছে, কোন দিন তারা এসে পড়বে। আমি ভগবান লাভ না করে ঘরে ফিরব না, তাই বিদায় চাইছি।

তার পর দক্ষিণেশ্বর ছেড়ে চলে গেল গৌরী পন্ডিত পরে কেউ আর তার খোঁজ পায়নি

কিছুদিন পর ভৈরবী বললেন

বাবা, চল, তন্ত্র সাধনা করবে

মাকে জিজ্ঞেস করে আসি

৫৪

গদাধর মন্দিরে চললেন মায়ের অনুমতি নিতে

মা জগদম্বার অনুমতি প্রদান

মা, ভৈরবী তন্ত্র সাধনা করতে বলছে

তোকে শেখাবার জন্যই ভৈরবী এসেছে

[ক্রমশঃ

গদাধর জগদম্বার অনুমতি পেয়ে ভৈরবীর সহায়তায় শুরু করলেন তন্ত্র সাধনা

জগদম্বার কৃপায় গদাধর একে একে চৌষট্টি-খানা তন্ত্রে সিদ্ধি লাভ করেন।

ভৈরবী বললেন—

বাবা, তন্ত্র সাধনার সব কঠিন কঠিন সাধনা-যা করতে গিয়ে অধিকাংশ সাধক পথভ্রষ্ট হয়, তাতে তুমি উত্তীর্ন হয়েছ।

বৃহৎ এবং কঠিন এই তন্ত্র সাধনায় সিদ্ধি লাভ করে ঠাকুর দেখলেন সব সাধনার শেষে সেই মা'ই দেখা দেন

ক্রমে গদাধর অনুভব করলেন—

আমার শরীর এত হালকা হল কি করে

তোমার মধ্যে অষ্টসিদ্ধির আবির্ভাব হয়েছে

কিন্তু তোমার তার কোন প্রয়োজন নেই

তন্ত্র সাধনা করে ঠাকুর অনেক দিব্য শক্তি লাভ করেছিলেন। একদিন তিনি বললেন—

দেখ মথুর, উত্তর কালে বহু লোক এখানে আসবে ধর্ম লাভের জন্যে এবং তারাও ধন্য হবে।

বেশ তো বাবা, সে তো খুব আনন্দের কথা

বেশ কিছুদিন পর এক বৈষ্ণব সাধক এলেন দক্ষিণেশ্বরে সঙ্গে একটি ছোট্ট রাম মূর্তি।

দক্ষিণেশ্বরে এসে সাধু মূর্তিটিকে উপযুক্ত স্থানে স্থাপন করে পূজা-পাঠের মধ্য দিয়ে কাটাতে লাগলেন

একদিন ঠাকুর এলেন সাধুর কাছে-

আপনি কোথা থেকে আসছেন?

পশ্চিম দেশ থেকে, আমি রামাইয়াৎ সম্প্রদায় ভুক্ত।

আপনি কি করেন?

এ মূর্তিটি আমার রামলালা। আমি ওকে ছেলের মত যত্ন করি

পরদিন সাধু তাঁর ইষ্ট দেবতার ধ্যানে বসে দেখলেন-
তাঁর রামলালা মন্দিরের সাধুর সঙ্গে খেলা করছেন-

একি! আমার ইষ্ট দেবতা মন্দিরের সাধুর সঙ্গে বেশী ভাব করেছে!

পরদিন সাধু তাঁর রাম মূর্তির সামনে বসে ভোগ নিবেদন করলেন

এসো হে নর-নারায়ণ রাম-চন্দ্র। এসো গ্রহণ কর-

কই এখনও তো দেখা দিচ্ছে না! তবে কোথায় গেল

৫৬

[ক্রমশঃ]

সাধু তার ইষ্ট দেবতা রামচন্দ্রকে ভোগ গ্রহণে আহ্বানের চেষ্টায় বিফল হয়ে এলেন ঠাকুরের কাছে
সাধু মানস দৃষ্টিতে দেখলেন তাঁর রামচন্দ্র বসে আছেন গদাধরের কোলে—
তাহলে তুমি এখানেই থাকতে চাও ঠাকুর—
এখন থেকে তুমিই আমার এই রামলালার ভার নাও
এখন থেকে গদাধরই তার সেবা করতে লাগলেন—
রামলালাও এখন সর্বদা গদাধরের সঙ্গেই থাকে।
গদাধর চলেছে স্নান করতে সঙ্গে চলেছে রামলালাও

গদাধর রামলালাকে নিয়ে স্নান করতে গঙ্গায় নামে-

এই-এই খানে বলছি, আর জলে হুড়োহুড়ি করবি না। কি-কথা কানে যাচ্ছে না?

গদাধর দেখে, তাঁর রামলালা তাঁকে ছেড়ে জলের মধ্যে হুটোপাটি করছে-

কিছুতেই জল থেকে তুলতে না পেরে

এইবার, কেমন মজা

উঃ, উপ!

জলের মধ্যে হাঁপিয়ে উঠে রামলালা-

গদাধর দেখে তার প্রেমের ঠাকুরের নয়নযুগল অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠেছে

আমি তোমাকে কত কষ্ট দিলাম ঠাকুর

এমনই ছিল গদাধরের ভক্তি আর ভালবাসা

এর কিছুদিন পর আর একজন সাধু এসে উপস্থিত হল দক্ষিণেশ্বরে। সেও একজন রামাইয়াৎ। তার একটা বই আর লোটা সম্বল। সাধু ঐ বইটাকে ফুল দিয়ে পূজো করতো

৫৮

[ক্রমশঃ]

গদাধর সাধুকে দেখতে এলেন—

হ্যাঁগো, তুমি কে? আর করই বা কি?

আমি একজন রাম-ভক্ত

তা তোমাকে তো শুধু ঐ বইটাই পুজো করতে দেখি। কি আছে ঐ বইটায়, একবার দেখাবে?

একি! সারা বইয়ের পাতা জুড়ে খালি ওঁ-রাম কথাটাই লেখা রয়েছে!

ওঁ রাম ওঁ রাম

অনেক বই পড়ে কি হবে, ঈশ্বর তো এক, সমস্ত বেদ পুরান তো তার থেকেই উৎপত্তি। সব শাস্ত্রে যা আছে, তার একটি নামেতে সে সবই রয়েছে। তাই তাঁর নাম নিয়েই আছি।

একদিন মথুরবাবু হৃদয়কে বললেন

দেখ হৃদয়, আমার ইচ্ছে কিছু জমিজমা লিখে দিই ঠাকুরের নামে...

সে তো খুব ভাল কথা রাজাবাবু, কিন্তু...

কথাটা গদাধরের কানে যেতেই—

শালা, তুই আমাকে বিষয়ী করতে চাস?

আমাকে ক্ষমা করো, বাবা!

গদাধরের বাৎসল্য ভাবের সাধনা শেষ হল। এর কিছুদিন পর এক সাধু এলো দক্ষিনেশ্বরে। নাম- তোতাপুরী

তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তুমি বড় সাধক, বেদান্ত সাধনা করবে?

মা আদেশ দিলে করব

যাও, মাকে জিজ্ঞেস করে এসো

মা-জগদম্বার অনুমতি পেলেন গদাধর

সাধু তোমাকে শেখাতেই এসেছেন

ভেবেছিলুম, গর্ভধারিণী মার অনুমতি নিতে গেছে। কিন্তু মৃণ্ময় প্রতিমা, কি কু-সংস্কার! জ্ঞান হলে এ ভাব থাকবে না

মা বলেছে শিখতে

নির্জন পঞ্চবটীর নীচে তোতা-পুরীর কাছে শুরু হল গদাধরের বেদান্ত সাধনা—

আজ তোমার সংসারী জীবনের মৃত্যু হল। আজ থেকে তোমার নাম হল, রামকৃষ্ণ

৬০

[ক্রমশঃ]

তোতাপুরীর কাছে গদাধরের বেদান্ত সাধনা—

তোমাকে সন্ন্যাস দিলাম। ধ্যান কর, কেউ কোথাও নেই, সব শূন্য

কিন্তু গদাধরের মানস দৃষ্টিতে মা ভবতারিণী

ধ্যান হচ্ছে না। মা-মনে এসে যাচ্ছে

কাছে নেই যোগা ?

দাঁড়াও, ব্যবস্থা করছি

এইখানে মনটা গুটিয়ে নিয়ে এসো

সাধু একটা কাঁচের টুকরো নিয়ে এসে ঠাকুরের কপালে বিঁধিয়ে দেয়—

নাও, এবার শুরু কর

ধীরে ধীরে রামকৃষ্ণও সমাধিস্থ হয়—

এইভাবে তিন দিন কেটে যায়। এদিকে কুটিরের বাইরে অপেক্ষমান তোতা

একি, এখনও ধ্যান ভাঙছে না!

সন্ন্যাসী বিস্মিত ও মুগ্ধ

এ কেয়্যা দৈবী মায়া!

যে অবস্থা পেতে আমার চল্লিশ বছর কেটে গেছে, আর ইনি, তিন দিনে তা পেলেন!

কিন্তু এখনও বাহ্য চেতনা আসছে না কেন?

নাঃ, এবার এঁকে জাগানো দরকার—
হরি ওঁ-হরি ওঁ-হরি ওঁ-

ক্রমশঃ রামকৃষ্ণের বাহ্য চেতনা ফিরে আসে-

এমন সময়—

একি! মামা, তুমি এখানে? কত খুঁজছি তোমাকে!

হ্যাঁ, চল।

৬২

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

তোতাপুরী দীর্ঘ এগার মাস দক্ষিণেশ্বরে অতিবাহিত করেন। একদিন গভীর রাত্রে ধুনি জেলে ধ্যানের আয়োজন করছেন, এমন সময় পঞ্চবটীর গাছপালা প্রকম্পিত করে নেমে এলো এক দীর্ঘকায় পুরুষ

কে তুমি?

আমি, দেবযোনি ভৈরব। এই দেবস্থান রক্ষার জন্য এই গাছের উপর বাস করি।

নির্ভীক তোতাপুরী বললেন—

তুমি ও আমি একই ব্রহ্মের প্রকাশ। এস বস ধ্যান কর।

তোতাপুরীর কথা শুনে ভৈরব অদৃশ্য হল—

পরদিন এই কথা শুনে ঠাকুর বললেন

হ্যাঁ, উনি এখানে থাকেন। আমি তাঁকে দেখেছি। এক এক সময় উনি ভবিষ্যৎও বলে দেন। একদিন হয়েছে কি—

কোম্পানি, বারুদখানার জন্য পঞ্চবটীর সব জমি নিতে চেষ্টা করে— মথুর তো দিলে মামলা লাগিয়ে। আমার ভীষণ চিন্তা হল।

একদিন যাচ্ছি, দেখি ভৈরব গাছে বসে আছে। সে বললে—

কোম্পানি জায়গা নিতে পারবে না, মামলায় হেরে যাবে

হলও তাই, কোম্পানি মামলায় হেরে গেল।

তোতাপুরী রামকৃষ্ণ ও আরও অনেকে মিলে পঞ্চবটীতে ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনায় মত্ত—

শোন, ঈশ্বর হল নিরাকার ব্রহ্ম। জগতের সব কিছুই সেই ব্রহ্মের প্রকাশ। ব্রহ্ম অভিন্ন। তোমাদের ঐ মূর্তি পূজা নেহাত কুসংস্কার ছাড়া আর কিছুই না।

আরে, ব্রহ্ম ও শক্তিতে কোন ভেদ নাই। মা-জগদম্বাই তোমার ঐ ব্রহ্ম

সন্ধ্যা হয়ে এলো। ঠাকুর আলোচনা স্থগিত রেখে করতালি দিয়ে উচ্চৈস্বরে ঈশ্বরের নাম গান আরম্ভ করলেন

...আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী, যেমনি চালাও তেমনি চলি...

আরে, ক্যায়া। তুম, রোটি ঠোকতে হো?

দূর শালা! আমি ঈশ্বরের নাম করছি, আর তুমি বলছ কিনা রুটি ঠুকছি!

তোতা বুঝলো ঠাকুরের এইরূপ অনুষ্ঠান অর্থহীন নয়। ঈশ্বর সাধনায় এরও প্রয়োজন আছে

একদিন পঞ্চবটীতে ঠাকুর রামকৃষ্ণ ও তোতাপুরী—

এমন সময় বাগানের এক মালী—

যাই, দেখি, সাধুদের ঐ ধুনির আগুন থেকে কলকেটা ধরিয়ে নেওয়া যায় কিনা।

৬৪

[ক্রমশঃ]

মালীটি সাধুদের ঐ ধুনি থেকে আগুন নিয়ে তার কল্‌কেটি জ্বালাতে প্রবৃত্ত হয়।

ব্যাপারটা তোতার নজরে পড়তেই ভীষণ রেগে গিয়ে তাকে তাড়া করে

এইও উল্লুক কাঁহেকা, তুই আগুন নেবার আর জায়গা পেলি না?

দূর্‌ শালা, দূর্‌ শালা, হাঃ-হাঃ-হাঃ

তুমি হাসছ যে? লোকটার কি অন্যায় বল দেখি!

অন্যায় তো বটেই। সেই সঙ্গে তোমার ব্রহ্ম জ্ঞানের দৌড়টাও দেখেছি। হাঃ-হাঃ-হাঃ।

কেন?

এই মুখে বলছ—ব্রহ্ম ভিন্ন দ্বিতীয় কোন সত্তাই নেই, জগতে সকল বস্তু ও ব্যক্তি তারই প্রকাশ, আর আর পরক্ষণেই সব ভুলে তাকেই মারতে উঠেছ! তাই হাসছি যে, মায়ার কি প্রভাব!

ঠিক বলেছ ক্রোধে সব কথা ভুলে গিয়েছিলাম! ক্রোধ বড় পাজী জিনিস। আজ থেকে ক্রোধ পরিত্যাগ করলুম

তোতাপুরী পশ্চিমের লোক। নিরোগ ছিল তাঁর দেহ। এ হেন দেহেও একদিন দেখা দিল রোগের প্রাদুর্ভাব। তোতা পড়লো কঠিন আমাশয় রোগে

উঃ, একি ব্যামোতে ধরল আমাকে! পেটের যন্ত্রনায় আমার যপ-তপ সব বন্ধ হবার যোগাড়। পূর্বে এরকম তো কখনও হয়নি

দিন দিন রোগের প্রকোপ সমানে বেড়েই চলে, কিছুতেই কিছু হয়না

নাঃ, এখন এ স্থান ত্যাগ করাই শ্রেয়

রামকৃষ্ণ, তোমাদের দেশে এসে একি রোগে ধরল বলত? এ যে একেবারে অসহ্য হয়ে উঠেছে! ঠিক করেছি-কালই অন্যত্র চলে যাব

কিন্তু আমি যে মথুরকে বলে তোমার সব রকম চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দিয়েছি। তাতেও কেন যে কোন কাজ হচ্ছে না, তা বুঝতে পারছি না

এইভাবে আরও বেশ কিছুদিন কেটে যায়—

নাঃ, আর পারা যাচ্ছে না! অথচ এখান থেকে কত দিন ধরে যাব যাব করেও যেতে পারছি না, কেন। আমার একি হল?

রাত তখন গভীর। নিঝুম পঞ্চবটীতে তোতাপুরী

ধ্যুৎ, আর নয়। এ দেহ তো রক্তরসপূর্ণ হাড়মাসের খাঁচা। যখন জেনেছি, আত্মার সঙ্গে দেহের কোন সম্পর্ক নেই, তবে আর কেন এ পচা দেহটা রেখে যন্ত্রণায় মরি।

আজ এই গভীর রাত্রে এ দেহটাকে গঙ্গায় বিসর্জন দিয়ে সব যন্ত্রণার অবসান করবো

তোতাপুরী দেহত্যাগ করার জন্য গঙ্গায় অবতরণ করলেন

৬৬

(ক্রমশঃ)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

একি! আমিযে হাঁটতে হাঁটতে গঙ্গার অপর পারে চলে এলাম, অথচ কোথাও ডুব জল পেলাম না!

ঈশ্বরের একি অপূর্ব লীলা! আমি এ কি দেখছি!

তোতার অন্তরে উদ্ভাসিত হল এক ভুবন জোড়া মোহিনী মাতৃ মূর্তি। তিনিই হয়কে নয়, নয়কে হয় করছেন। জগতে সব কিছু তাঁর ইচ্ছায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে। তোতার উপাস্য সেই ব্রহ্ম -- তিনিও সেই মা। তোতা দেখল, ব্রহ্ম ও শক্তি অভিন্ন

তোতাপুরী এক দিব্যজ্ঞান নিয়ে ফিরে এলেন পঞ্চবটীতে --

পরদিন সকালে --

এসো রামকৃষ্ণ। কাল আমি মা-জগদম্বার দর্শন পেয়েছি। এখন আমি রোগমুক্ত। বুঝেছি তিনিই আমাকে এই শিক্ষাটুকু দেবার জন্যে এখান থেকে যেতে দেননি। এবার তোমার মাকে বলে আমাকে এখান থেকে যেতে দাও।

কি? আগে তো মাকে মানতেই না, বলতে শক্তি মিথ্যা। এখন কেমন, দেখলে তো ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ

তারপর, গুরু-শিষ্য দুই মহাপুরুষ মন্দিরে চললেন মাতৃ দর্শনাভিলাসে

কয়েকদিন পরে তোতাপুরী, ঠাকুরের কাছে চির বিদায় নিয়ে দক্ষিণেশ্বর ছেড়ে চলে গেলেন --

বেদান্ত সাধনের পর ঠাকুর মাঝে মাঝে অদ্বৈত ভাবে অবস্থান করতেন। তখন তিনি পূর্ণ এক ভাব রাজ্যে উপনীত হতেন। একদিন তিনি দক্ষিণেশ্বরের ঘাটের সোপানে দাঁড়িয়ে আছেন এমন সময় তিনি দেখলেন, গঙ্গায় কলহরত দুই মাঝিকে

কি, তোর যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা!

কেন, তুই মারবি নাকি? নৌকা কি তোর একার?

হঠাৎ একজন মাঝি অন্য জনকে সজোরে আঘাত করে

ঘাটে দণ্ডায়মান ঠাকুর সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠলেন

উঃ!

চিৎকার শুনে হৃদয় ছুটে আসে

কি কি, হয়েছে মামা?

ইস্, পিঠে একেবারে কালশিটে ফেলে দিয়েছে! কে তোমার এ দশা করেছে বলত; তাকে সমুচিত শিক্ষা দিয়ে দিই।

না-না, আমাকে কেউ মারেনি। ঐ মাঝি দুজন, একে অন্যকে মারতে আমার গায়েও ঐ আঘাত লেগেছে।

ঠাকুরের কথায় স্তম্ভিত হয়ে যায় হৃদয়

এও কি সম্ভব!

(ক্রমশঃ)

কিছুকাল পর মথুরানাথের স্ত্রী জগদম্বা দাসী গ্রহণী রোগে আক্রান্ত হন। কিছুতেই কিছু হল না দেখে মথুরবাবু ঠাকুরের স্মরণাপন্ন হন

বাবা, এবার আমি বোধহয় তোমার সেবাধিকার থেকে বঞ্চিত হতে চলেছি

হ্যাঁ বাবা, জগদম্বাকে হয়তো আর বাঁচানো যাবে না। ওঁর মৃত্যু হলে আমি আমার সমস্ত বিষয় সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হব। এখন একমাত্র আপনিই পারেন আমাকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করতে।

মথুরবাবুর কথা শুনে ঠাকুরের হৃদয় বিগলিত হল

যাও, ভয় নেই, তোমার স্ত্রী ভাল হয়ে যাবে।

সেই দিন থেকে জগদম্বা দাসী আরোগ্য লাভ করতে লাগলেন

এখন কেমন বোধ করছো?

খুব ভাল

ঠাকুরের অসীম কৃপা!

এর পর থেকে ঠাকুর পড়লেন কঠিন রোগে

হ্যাঁ, জগদম্বার রোগটা আমার এই শরীরের উপর দিয়ে গেল। তার জন্য পাঁচ-ছ মাস আমাকে ভুগতে হল

দিন দিন ঠাকুরের প্রতি মথুরের ভক্তি বিশ্বাস যতই বাড়তে লাগল, ততই কি করে তাঁকে আরও বেশী সেবা করা যায় সেই চিন্তা তাঁকে পেয়ে বসল। একদিন—

বাবা, আপনার জন্যে আমি এই শালটা বহু মূল্যে ক্রয় করেছি। আপনি এটা ব্যবহার করলে আমি খুশি হব।

শাল গায় দিয়ে ঠাকুরের খুব আনন্দ

হ্যাঁ, এই শালটা মথুর দিয়েছে

কেমন, সুন্দর না শালটা? দামও খুব বেশী।

পরক্ষণেই—

আরে, এ আর কি! কাঁথা-কম্বলেও তো এর থেকে কম গরম হয় না, বরং এটা গায়ে দিলে অহংভাব আসে। এতে ভগবান লাভও হয় না

এতে এত দোষ! তবে আমার এর প্রয়োজন কি? থু-থু-থু

আরে, মামা! করো কি-করো কি, থামো!

ইস, এত দামী শালটার একি দশা করলে বলতো? আর একটু হলেই দফারফা হয়েছিল!

ও আমার চাই না। তুই নিয়ে যা।

এ কথা জানতে পেরে মথুরবাবু বললেন

না বাবা, এ আপনি ঠিক করেছেন

৭০

[ক্রমশঃ]

বেশ কিছুদিন আগে থেকেই ঠাকুরের জননী দক্ষিণেশ্বরে এসে বসবাস করছিলেন। একদিন মথুরবাবু তাঁর কাছে এলেন

ঠাকুরমা, তুমি তো আমার কাছ থেকে কোন দিন কিছু গ্রহণ করলে না। তুমি যদি আমাকে সত্যই আপনার বলে ভাব, তবে তুমি আমার কাছ থেকে কিছু নাও

সরল হৃদয়া বৃদ্ধা মথুরের ঐ কথায় বিপন্ন বোধ করলেন

বাবা, তোমার কল্যাণে আমার যে কোন কিছুর অভাব নেই। আমাদের সকল বন্দোবস্ত তো তুমি করে দিয়েছ। তবে আর কি?

তবু যা হোক কিছু নাও।

মথুরের পীড়াপীড়িতে অবশেষে

যদি নেহাতই কিছু দেবে তবে, আমার এখন মুখে দেবার গুলের অভাব, এক আনার দোক্তা কিনে দাও।

এমন মা না হলে কি অমন ত্যাগশীল পুত্র হয়

ঠাকুরের প্রতি মথুরবাবুর অচলা ভক্তি দেখে কালীঘাটের হালদার পুরোহিত হিংসায় জ্বলে মরে

লোকটা নিশ্চয়ই বাবুটাকে কেমন গুণটুন করেছে! তাই তো আমার বাবুটাকে হাত করার এত চেষ্টা এ লোকটার জন্য পন্ড হল। দেখি কোন উপায়ে যদি ওর কাছ থেকে বশীকরণ মন্ত্রটা জানতে পারি।

ঐ তো, ব্যাটা একাই বসে আছে দেখছি! মন্ত্রটা জেনে নেবার এই-ই উপযুক্ত সময়

একদিন সন্ধ্যেবেলা ঠাকুর ভাবাবেশে বসে আছেন। এমন সময় উক্ত হালদার পুরোহিত এসে উপস্থিত-

এই বামুন-এই বামুন, বল না, কি করে বাবুটাকে এমন বশ করলি। কি হল তোর? বল না..

কিন্তু ঠাকুর নির্বিকার--

ঢঙ করে আবার চুপ করে আছিস কেন? বল না বাবুকে বশ করার মন্ত্রটা

কিছুতেই কোন কথা বার করতে না পেরে ভীষণ রেগে গেল

যা, শালা বললি না!

৭২

নিরভিমান ঠাকুরও এ নিয়ে আর হৈ চৈ করলেন না

এ কথা জানতে পারলে মথুর ওর উপর অত্যাচার করবে। সুতরাং কিছু না বলাই ভাল।

কিছুদিন পর মথুরবাবু অন্য একটা ব্যাপার নিয়ে ঐ ব্রাহ্মণের উপর ক্রুদ্ধ হলেন।

আপনার বড় বাড় বেড়েছে না? বেরিয়ে যান বলছি। আর কখনও এখানে যেন না দেখি

একদিন কথায় কথায়

হ্যাঁ, ওকে আমি আমার গুপ্ত মন্ত্রটা বলিনি বলে আমাকে লাথি মেরে চলে গিয়েছিল

বল কি, বাবা! এ কথা আমি আগে জানলে, ওর ধড়ে মুণ্ডু থাকত না।

ঠাকুরের অগ্রজ রামকুমারের পুত্র অক্ষয় একজন কম ভক্ত ছিল না। কামারপুকুরের নিকটে কুচেকোল গ্রামে এক কন্যার সঙ্গে তার বিবাহ হয়। বিবাহের মাস খানেক পর শ্বশুর বাড়িতে গিয়ে সে পীড়িত হয়ে পড়ে এবং চিকিৎসার জন্য তাকে দক্ষিণেশ্বরে আনা হয়। সব শুনে ঠাকুর বললেন—

হৃদু অক্ষয়ের বিকার হয়েছে। ছোঁড়া বাঁচবে না। ভাল ডাক্তার এনে আশ মিটিয়ে চিকিৎসা কর।

ছি-ছি, মামা! তোমার মুখ দিয়ে ও কথা বেরুল?

আমি কি ইচ্ছে করে বলেছি। মা আমাকে যেমন বলালেন আমি তেমনি বললুম। আমার কি ইচ্ছে অক্ষয় মারা যাক।

রোগ ক্রমশঃ বেড়েই চলল। মাসখানেক পর অন্তিম সময়ে ঠাকুর এলেন তার শয্যা পাশে—

অক্ষয়, বল, গঙ্গা নারায়ণ ওঁ রাম...

গঙ্গা নারায়ণ ওঁ রাম গঙ্গা নারায়ণ... ওঁ রাম... গঙ্গা নারায়ণ ওঁ রাম...

অক্ষয়ের মৃত্যুতে আর সকলে শোকার্ত হলেও ঠাকুর ভাবাবেশে হাসতে লাগলেন

রামকৃষ্ণ পঞ্চবটীতে বসে আছেন এমন সময় একজন লোক এলো তাঁর কাছে

কি চাই হে তোমার?

আমার কুষ্ঠ হয়েছে

তা আমি কি করবো?

আপনি যদি আমার হাতে একবার হাত বুলিয়ে দেন তাহলেই আমার রোগ সেরে যাবে।

কি বিশ্বাস

আচ্ছা এসো হাত বুলিয়ে দিচ্ছি।
ঠাকুর তাঁর পবিত্র হাত বুলিয়ে দিলেন কুষ্ঠের উপর
পরক্ষণেই যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠলেন রামকৃষ্ণ
উঃ, জ্বলে গেল—জ্বলে গেল! মা আর কখনও এমব কাজ করবো না..
কিছুদিন পর--
সত্যি, আমার কুষ্ঠ সেরে গেছে!
ওর কুষ্ঠ সেরে গেল। কিন্তু তার জেরটা উপর দিয়ে হয়ে গেলো.
এর মধ্যে এক সময় মন্দিরে চুরি হয়। তখন মন্দিরের পুরানো দারোয়ানকে অপদার্থ ভেবে মথুরবাবু একজন ভোজপুরী পালোয়ান নিয়ে আসে—
আমার কি কসুর রাজা সাহেব?
৭৪
তুমি দুর্বল হনুমান সিং, চোর তাড়াতে পার না
আপনার ভোজপুরী কি আমার চেয়েও পালোয়ান?

(ক্রমশঃ)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

তুমি কি ভোজপুরীর সঙ্গে লড়ে পরখ করতে চাও, কে বড় পালোয়ান?

জী—

বেশ এক সপ্তাহ বাদে তোমাদের লড়াই হবে।

সঙ্গে সঙ্গে ভোজপুরী শরীর কসরতে লেগে যায়

আর হনুমান সিং পূজা-পাঠে মনোনিবেশ করে

দিন-দিন ভোজপুরী তার ডন-বৈঠক আর ভোজনের পরিমাণ বাড়িয়ে চলে

এদিকে পূজা পাঠে রত হনুমান সিং

কি হনুমান সিং, তুমি শরীর চর্চা করছ না, খাচ্ছ না, তুমি ওর সঙ্গে লড়বে কি করে?

আপনার কৃপা থাকলে সব হবে

নির্দিষ্ট দিনে আরম্ভ হল হনুমান সিং আর ভোজপুরীর লড়াই

ঠিক চরম মুহূর্তে সবার অলক্ষ্যে ঠাকুরের মধ্য থেকে একটা জ্যোতি গিয়ে পড়ে হনুমান সিং এর দেহে

এবং পরক্ষণেই এক আছাড়! দর্শকেরা বিস্ময়াবিভূত

হনুমান সিং ওকে হারিয়ে দিলে!

উঃ!

৭৬

মা ভবতারিণীর দয়ায় কিনা হয়। হনুমান সিং কত বড় ভক্ত।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

—দিলীপ দাস

ঠাকুরের অলৌকিকত্ব দর্শন ও শ্রবণে হৃদয়েরও ইচ্ছা হল ঐ রকম সব পাবার, শুরু করলো ধ্যান-জপ, অবশেষে একদিন ঠাকুরকে জানালো তার অভিপ্রায়

মামা, আমাকে তোমার মত ঐসব আধ্যাত্মিক উপলব্ধি যাতে হয়, তার ব্যবস্থা করে দিতে হবে

ওরে হৃদে, তোর এ সবের কোন প্রয়োজন নেই আমাকে সেবা করলেই তোর সব হবে।

না মামা তুমি আমাকে শেখাও

আমার ইচ্ছায় কি কিছু হয় রে! সব মার ইচ্ছায়। তাঁর ইচ্ছা হয় তো তোর হবে।

একদিন হৃদয় ঠাকুরের সঙ্গে পঞ্চবটীর দিকে চলেছে।

এমন সময়—

ও কি! কে ও!

হৃদয়ের চোখের সামনে ভেসে উঠল ঠাকুরের অপূর্ব এক জ্যোতির্ময় দেব মূর্তি!

অ্যাঁ! আমি ভুল দেখছি না তো!

একি! আমিও যে...!
নিজেকেও দেখতে পায় এক জ্যোতির্ময় পুরুষ রূপে। সে যেন সম্মুখস্থিত ঐ দেবতার অনুচর
ভাবাবেশে উন্মাদের মত চিৎকার করে উঠে হৃদয়
ও রামকৃষ্ণ, ও রামকৃষ্ণ, আমরা তো মানুষ নই! তুমিও যা, আমিও তাই... চল...
ওরে থাম, থাম অমন করে চেঁচাচ্ছিস কেন? এখুনি সব লোক-জন ছুটে আসবে!
চিৎকার কিছুতেই থামে না দেখে, ঠাকুর তাড়াতাড়ি এসে হৃদয়ের বুকে হাত বুলিয়ে দেয়
দে মা, দে, শালাকে জড় করে দে
সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য হল সেই অপূর্ব দর্শণ আর উপলব্ধি। কাঁদতে লাগল হৃদয়
মামা—কেন তুমি অমন বললে? আমার আর ঐ রকম দর্শণ হবে না!
৭৮
আমি কি তোকে একেবারে জড় হতে বলেছি, তোর সময় হলে আবার হবে। সামান্য দর্শণ করে তুই যা গোলমাল শুরু করলি, তাই তো আমি জড় হতে বললুম। চব্বিশ ঘন্টা আমি কত কি দেখি তা বলে কি আমি ঐ রকম হৈ-চৈ করি?

(ক্রমশঃ)

ঠাকুরের নিষেধ সত্ত্বেও হৃদয় আবার তার ধ্যান জপ শুরু করলো

মামা যেখানে যেখানে বসে ধ্যান করে আমিও সেখানে বসে ধ্যান করবো

পরদিন ঠাকুর যাচ্ছিলেন পঞ্চবটীর দিকে। এমন সময়

মামা-গো পুড়ে মলুম..... জ্বলে গেল.....

ওকি! ওটা হৃদের গলা না?

ঠাকুর ছুটে গেলেন ঘটনাস্থলে—

কিরে, কি হলো তোর?

উঃ, মামা গো— জ্বলে গেলো...!

এখানে, তোমার আসনে ধ্যান করতে বসামাত্র মনে হল কে যেন এক মালসা আগুন ঢেলে দিয়েছে আমার শরীরে...

ঠাকুর তাড়াতাড়ি হাত বুলিয়ে দিলেন হৃদয়ের দেহে

যাঃ, ঠান্ডা হয়ে যাবে

আঃ, এতক্ষণে সব জ্বালা দূর হল

তুই কেন এরকম করিস বলতো? তোকে তো বলেছি; আমার সেবা করলেই তোর সব হবে

একদিন হৃদয় এলো ঠাকুরের কাছে—
কে রে, হৃদে ? আবার কি ?
মামা, আমি এবার বাড়িতে দুর্গাপূজো করবো ঠিক করেছি।

বেশ তো।
আমার ইচ্ছা, পুজোর কটা দিন তুমি আমার বাড়িতেই কাটাবে।

কিন্তু আমি তো এখন যেতে পারবো না।
কেন ?
তুই কোন দুঃখ করিস না। ভালভাবে পুজো কর, আমি রোজ সূক্ষ্ম শরীরে তোর পুজো দেখতে যাব। অন্য কেউ আমাকে দেখতে পাবে না, কিন্তু তুই পাবি।

হৃদয়ের বাড়িতে দুর্গাপুজো
আজ সপ্তমী। সারা দিন তো গেল, মামা যে বলল, আমার পুজো দেখতে আসবে। কই ?

সেই দিন রাত্রে দুর্গাপ্রতিমার পাশে দণ্ডায়মান ঠাকুরের জ্যোতির্ময় মূর্তির দর্শন পেল হৃদয়
মামা !

পূজা শেষে দক্ষিণেশ্বরে ফিরে এলো হৃদয়—
হ্যাঁ, মামা। পুজোর চার দিনই তোমাকে মূর্তির পাশে দেখতে পেয়েছি।
হ্যাঁরে, আমিও তোর পুজো দেখবার জন্য সত্যই ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলাম
আমার এমন ভাব হয়েছিল, আমি অনুভব করেছিলাম যে, এক জ্যোতির্ময় পথ দিয়ে তোর পুজো মণ্ডপে উপস্থিত হয়েছি।

[ক্রমশঃ]

ঠাকুর প্রায়ই পেটের অসুখে ভুগতেন, তাই মাঝে মাঝে কামারপুকুরে জলহাওয়া পাল্টাতে যেতেন। তাঁর আগমনে সেখানে একটা আনন্দের হাট বসে যেত। ওকে দেখতে এবং ওর কথা শুনতে সব সময় বাড়িতে পাড়াপ্রতিবেশীর ভিড় লেগেই থাকত।
রাত্রিকাল — অনেকেই শুয়ে পড়েছে। এমন সময় দরজা খুলে ভাবাবেশে টলতে টলতে বেরিয়ে এলেন রামকৃষ্ণ
কি গো, তোমরা সব শুলে নাকি? আমাকে না খেতে দিয়েই শুয়ে পড়লে যে?
ওমা, সে কি! এই যে তুমি খেলে!
কৈ খেলুম, এই তো আমি দক্ষিণেশ্বর থেকে আসছি
এখন উপায়! ঘরে তো মুড়ি ছাড়া আর কিছুই নেই!
মুড়ি আছে। শুধু মুড়ি খাবে? ওতে তোমার পেটও খারাপ হবে না।
না, শুধু মুড়ি খেতে পারবো না।
দেখ, তোমার পেট ভাল নয়। অন্য কিছু খাওয়া উচিত নয়, তাছাড়া দোকান-পাটও এখন সব বন্ধ হয়ে গেছে।
না। ও আমি খাব না
ও রামলাল, শুয়ে পড়লি নাকি? ওঠ দ্যাখ কোথাও কিছু পাস্ কিনা
এত রাত্রে?
সেই রাত্রে স্থানীয় এক দোকানীকে জাগিয়ে এক সের মিষ্টি নিয়ে আসে রামলাল।

সেই এক সের মিষ্টি ও সঙ্গে সমপরিমাণ মুড়ি ঠাকুরকে খেতে দেওয়া হলে তবে তিনি সন্তুষ্ট হন—

ইস, এত মুড়ি আর মিষ্টি খেয়ে উনি আবার না অসুস্থে পড়েন!

খেয়ে পরিতৃপ্ত হলেন ঠাকুর—

পরদিন সকালে দিব্যি সুস্থ দেহে ঘুরে-ফিরে বেড়াতে দেখা গেল ঠাকুরকে—

কি গো, তুমি আজ ভাত খাবে তো?

হঁ্যা, খাবো

আর একবার দক্ষিণেশ্বরে-গভীর রাত্রি—ঠাকুর বাইরে উঠে এলেন-

ওরে, তোরা কে আছিস? আমার খুব খিদে পেয়েছে যে...

সে কি! এখন তো খেতে দেবার মত ঘরে কিছু নেই!

না, তুই দ্যাখ কোথাও কিছু আছে কিনা

আচ্ছা দাঁড়াও, নহবতখানায় গিয়ে দেখি, ওখানে কিছু আছে কিনা

৮২

সেই গভীর রাত্রে রামলাল নহবত খানায় গিয়ে শ্রীমাকে জানালো ঠাকুরের খিদের কথা—

এত রাতে ওনার খিদে পেয়েছে? আচ্ছা, তুমি যাও। কিছু সুজি আছে, আমি হালুয়া তৈরী করে কাউকে দিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

সেই রাত্রে শ্রীমা উনুন জ্বেলে এক সেরের মত হালুয়া তৈরী করলেন ঠাকুরের জন্যে

জনৈক স্ত্রী ভক্ত সেই হলুয়া নিয়ে যায় ঠাকুরের নিকট

তাঁর নির্জন ঘরে ভাবাবেশে পদচারণ রত ঠাকুরের সামনে রাখলেন সেই বাটি ভর্তি হলুয়া

ভক্তটি নির্বাক বিস্ময়ে চেয়ে থাকে ভোজন রত ঠাকুরের দিকে—

আচ্ছা, বল দেখি কে এই সব খাচ্ছে? আমি খাচ্ছি না, অন্য কেউ খাচ্ছে?

আমার মনে হয় আপনার ভিতর আর এক জন আছে, তিনিই খাচ্ছেন।

ঠিক বলেছ।

তখন বর্ধমানে পদ্মলোচন নামে এক বিখ্যাত পণ্ডিত বাস করতেন। ঠাকুরের ইচ্ছা হল তাঁকে দেখবার
হঠাৎ ঠাকুর শুনলেন পণ্ডিত আড়িয়াদহের কোথাও এসে উঠেছেন।

হ্যাঁরে হৃদে, পণ্ডিতজি নাকি এদিকে কাছাকাছি কোথাও এসে উঠেছে, চল না দেখে আসি

এই পণ্ডিত আবার একজন তন্ত্রসাধক ছিলেন। তাঁর একটি সিদ্ধাই ছিল। তিনি সর্বদা একটা গাড়ু-আর গামছা সঙ্গে রাখতেন

কোথাও কোন কূটপ্রশ্নের মীমাংসা করতে বা আলোচনা সভায় প্রবেশের পূর্বে তিনি ঐ গাড়ু-গামছা নিয়ে কয়েক পা পরিভ্রমণ করে সভায় আসতেন। এতে তাঁর বিদ্যা-বুদ্ধি দৈববলে বলীয়ান হয়ে উঠত ফলে কেউ তাকে হারাতে পারতেন না। এই ব্যপারটি তিনি অত্যন্ত সযত্নে এতদিন গোপনেই রেখে ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ এলেন তাঁর কাছে দেখা করতে।

জগদম্বার কৃপায় পণ্ডিতজির এই গোপন বিদ্যাটি ঠাকুরের অজানা রইল না

একবার এক সভায় যোগদানের পূর্বে

এখন পণ্ডিতজি নেই, এই সুযোগে ওর গামছা-গাড়ু লুকিয়ে রাখি দেখি ব্যাটা এবার কি করে

সভায় প্রবেশের পূর্বে উদ্দিষ্ট বস্তু দুটির কোন সন্ধানই পেলেন না। ফলে—

কে নিল! কেউ কি লুকিয়ে রেখে মজা দেখছে? তাই বা সম্ভব কি করে?

কোন প্রশ্নেরই যথাযথ উত্তর দিতে পারলেন না।
তখন ঠাকুর—

গাড়ু গামছা হারিয়ে কি কোন প্রশ্নের মীমাংসা হয়?

কি বললেন? আপনি এ সব জানলেন কোথা থেকে?

ঠাকুর তার গুপ্ত বিদ্যাটি জেনে ফেলেছেন দেখে পন্ডিতজির বিস্ময়ের আর সীমা রইল না

আপনিই একমাত্র লোক, যিনি আমার এই গুপ্ত বিদ্যাটি জানতে পেরেছেন। আপনি সামান্য নন

বল কি পণ্ডিত!

আপনি একজন ঈশ্বরাবতার এবং আমি প্রমাণ করে দিতে পারি।

সেই সময় কলকাতায় কলুটোলা নামক স্থানে নিত্য হরিসভা হত। সেখানে একটি আসন পেতে রেখে এবং তাতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব কল্পনা করে ভক্তগণ পূজা-পাঠ করতেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ একবার এই সভায় আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। সভায় বসে পাঠ শুনতে শুনতে ঠাকুর ভাবাবেশে বিহ্বল হয়ে পড়েন এবং হঠাৎ সভা ছেড়ে ছুটে যান মহাপ্রভুর নির্দিষ্ট আসনের দিকে।

ভগবৎ-প্রেমে
আত্মহারা
ঠাকুর মহাপ্রভুর শূণ্য
আসনে দন্ডায়মান
হন এবং সম্পূর্ণ
সমাধিস্থ হয়ে যান

মহাপ্রভুর আসনে দন্ডায়-
মান ঠাকুরের অপূর্ব ভাব-
ঘন মূর্তি দর্শনে সকল ভক্ত
বৃন্দ মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গেলেন

সবাই হরিধ্বনি দিয়ে উঠলেন—

কিছু সময় পর ধীরে ধীরে ঠাকুরের বাহ্যজ্ঞান ফিরে আসে

কেউই বুঝতে পারলো না, ব্যাপারটা কি ঘটে গেল!
তারা এক অপূর্ব আনন্দ স্রোতে ভেসে গিয়ে
মেতে উঠল হরিনাম সংকীর্তনে।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

—দিলীপ দাস

মহাপ্রভুর পদাশ্রিত সিদ্ধ ভগবানদাস বাবাজী নিজ ইষ্ট দেবতার আসন শ্রীরামকৃষ্ণদেব নামে এক ব্যক্তির দ্বারা অধিকৃত হয়েছে শুনে ভীষণ রেগে গেলেন—

কি, এত বড় সাহস ঐ যাচ্চলটার! তোরা ওখানে কি করছিলি? ব্যাটার ঘাড় ধরে বার করে দিতে পারলি না? ভণ্ডামির জায়গা পায়নি!

এর কিছুদিন পর ঠাকুর এলেন কালনায়। সঙ্গে মথুরবাবু ও হৃদয়

মথুর, তুমি সব ব্যবস্থা কর। আমি হৃদেকে নিয়ে একটু ঘুরে আসি। শুনেছি, কাছেই কোথাও ভগবানদাস বাবাজীর আশ্রম

ভগবানদাস বাবাজীর আশ্রমে ঠাকুর ও হৃদয়ের প্রবেশ

...দেখে এই অনাচার আমি বরদাস্ত করবো না। আমি ঐ ভণ্ডটার মালা তিলক কেড়ে নিয়ে সম্প্রদায় থেকে তাড়াব।

আমরা দক্ষিণেশ্বর থেকে আসছি
ইনি আমার মামা। ঈশ্বর নামে কেমন বিহ্বল হয়ে পড়ে। আপনাকে দর্শন করতে এসেছেন

আচ্ছা, আপনাদের বসতে আজ্ঞা হোক।

হৃদয় ঠাকুরকে নিয়ে অন্যান্য ভক্তদের মাঝে আসন গ্রহণ করল। হৃদয় জানতো বাবাজী সিদ্ধ পুরুষ। অথচ তাঁকে মালা জপতে দেখে কৌতূহল বশতঃ সে জিজ্ঞাসা করে—

আচ্ছা বাবাজী, শুনেছি আপনি তো সিদ্ধ পুরুষ। তবুও কেন মালা জপছেন?

দেখ আমি সিদ্ধ পুরুষ হলে কি হবে, লোকশিক্ষা দেবার জন্য আমাকে এসব করতে হয়। নয়ত লোকে বিপথে-কুপথে যাবে। আমার কাছ থেকেই তো তারা উপযুক্ত শিক্ষা পাবে। তাই—

বাবাজীর বার বার ঐ 'আমি' শব্দের উচ্চারণে ঠাকুর আর চুপ করে বসে থাকতে পারলেন না। সরোষে গর্জে উঠলেন। এবং তখন তাঁর অঙ্গাবরণ সরে গিয়ে বিকশিত হয় এক জ্যোতির্ময় মূর্তি—

কি! তোমার এত অহংকার যে, তুমি তাড়বে? তুমি লোকশিক্ষা দেবে? তুমিই সব করবে? তুমি এসব করবার কে? যাঁর জগৎ তিনি না করলে, তিনি না শেখালে, তোমার কতটুকু ক্ষমতা?

এ পর্যন্ত কেউ বাবাজীর মুখের উপর কথা বলতে সাহস পায়নি। আজ ঠাকুরের এই বলদৃপ্ত প্রতিবাদে সভাস্থ লোক স্তম্ভিত। ঠাকুরের এইরূপ কথাতে তিনিও ক্রোধান্বিত হলেন না। উপরন্তু ঠাকুরের কথার যথার্থতা উপলব্ধি করলেন

এই কথাগুলি বলে ভাবাতিশয্যে সমাধিস্থ হয়ে নিশ্চল ভাবে দাঁড়িয়ে পড়লেন

ইনি তো সামান্য পুরুষ নন!

কিছু পরে ঠাকুরের সমাধিস্থতা ভাঙে—

বাবা, আপনি আজ আমার জ্ঞান চক্ষু ফোটালেন। এতদিন আমি অন্ধ ছিলাম। সত্যই মানুষ তার অবস্থার দাস মাত্র।

এই মহাপুরুষই শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর আসন অলংকৃত করেছিলেন

আপনিই সেই মহাপুরুষ! যাঁর পাদস্পর্শে মহাপ্রভুর আসন ধন্য হয়েছিল?

আমি আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থী। না জেনে আপনাকে অনেক কটূ কথা বলেছি।

তারপর সেখানে ঈশ্বর প্রসঙ্গে আলোচনার এক আনন্দের হাট বসল—

পরে আশ্রম থেকে ফিরে এসে—

দেখ মথুর, বাবাজীর আশ্রমের বিগ্রহের পূজা এবং একদিন মহোৎসবের আয়োজন তোমাকে করতে হবে

বাবা।

একদিন শ্রীশ্রীমা ঠাকুরের পদসেবা করছিলেন—

আমাকে তোমার কি মনে হয়?

যে মা মন্দিরে আছেন, তিনিই এই শরীরের জন্ম দিয়েছেন। তিনিই আমার পদসেবা করছেন। সাক্ষাৎ আনন্দময়ীরূপ হিসাবে তোমাকে সর্বদা সত্যই দেখি

ওকি করছ? আমি যে তোমার দাসী

তুমি যে আমার আনন্দময়ী মা জগদম্বার প্রতিমূর্তি

মথুরবাবু একদিন ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করলেন—

কই বাবা, তুমি যে বলেছিলে তোমার অনেক ভক্ত আসবে—কোথায় তারা?

কি জানি বাবু, মা তাদের কবে আনবেন। তারা সব আসবে একথা কিন্তু মা আমাকে নিজে জানিয়েছেন। অন্যান্য যা দেখিয়েছেন সে সবই তো একে একে সত্য হয়েছে, তবে এটা কেন ঠিক হল না কে জানে...।

কে জানে বাবু, তুমি যা বলছ তাই হবে হয়ত।

তারা আসুক আর নাই আসুক, আমি তো তোমার চিরানুগত ভক্ত রয়েছি, আর আমি তো একাই একশত ভক্তের সমান, তবে আর তোমার দর্শন মিথ্যা হল কোথায়?

একবার তৎকালীন বিখ্যাত ব্যারিস্টার মাইকেল মধুসূদন দত্ত জমিদারীর মামলা সংক্রান্ত ব্যাপারে দক্ষিণেশ্বরে আসেন

আচ্ছা, শুনেছি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এখানে থাকেন। তাঁর দর্শন পাব কি?

আপনি একটু বসুন, দেখছি।

মামা, এক সাহেব তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাইছে।
ওরে বাবা, সাহেব! আমি যেতে পারবনি
অনেক পীড়াপীড়িতে অবশেষে ঠাকুর রাজি হলেন—
আচ্ছা, আমি তোমার সঙ্গে যাচ্ছি-চল।
ইনিই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ। ... তুমি তো হিন্দু?
হ্যাঁ
তবে কেন তুমি স্বধর্ম ত্যাগ করলে?
পেটের জন্যেই আমাকে স্বধর্ম ত্যাগ করতে হয়েছে
পেটের জন্য ধর্ম-ত্যাগ! এ কি হীন বুদ্ধি
একেই আবার লোকে বড় বলে এর লেখা পড়ে!
আমি আপনার মুখ থেকে কিছু শুনতে চাই। আপনি কিছু বলুন
৯০

(ক্রমশঃ)

কিন্তু ঠাকুর অনেক চেষ্টা করেও কিছু বলতে পারলেন না।

অদৃশ্য কোন শক্তি যেন তাঁর মুখ চেপে ধরল

তখন ঠাকুর তাঁর মনমাতানো গান গেয়ে শোনালেন মাইকেলকে

আমার মত হতভাগা আর কে আছে? আমি ঠাকুরের আশীর্বাদটুকু পাবার যোগ্য নই।

ব্রাহ্মসমাজের নেতা শ্রীযুক্ত কেশব সেনের তখন খুব নাম-ডাক। একদিন ঠাকুর এলেন বেলঘরিয়ার বাগান বাড়িতে তাঁকে দেখতে –

আমার মামা দক্ষিণেশ্বর থেকে আপনাকে দেখতে এসেছেন

আচ্ছা, ওঁকে নিয়ে এসো

বিভিন্ন ধর্মীয় আলোচনার পর ঠাকুর গান ধরলেন-

কে জানে মন কালী কেমন ষড়দর্শনে না পায় দরশন...

এর পর থেকে ঠাকুরের প্রতি কেশব সেন খুবই আকৃষ্ট হলেন এবং প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত শুরু করলেন। একদিন —

কেশব তুমি এত লোককে তোমার বক্তৃতায় মুগ্ধ কর, আমাকে কিছু বল

মশাই আমি কি কামারের দোকানে ছুঁচ বেচতে আসব? আপনি কিছু বলুন আমি শুনি

তোমরা ঈশ্বরের ঐশ্বর্যের কথা অত করে বল কেন? আমরা তার সন্তান। সন্তান কি কি তার পিতার কত সম্পদ আছে- তাকে কত ভালবাসে এই ভেবে মুগ্ধ হয়? তাই যথার্থ ভক্ত তাঁর উপর আবদার করে, অভিমান করে, জোর করে বলে, তোমাকে আমার প্রার্থনা পূর্ণ করতেই হবে। তাঁকে খুব আপনার বলে ভাব, তবেই তাঁকে পাবে।

ঠাকুরের দিব্যভাব শ্রবণে তৎকালীন সিমলা নামক পল্লী নিবাসী সুরেন্দ্রনাথ মিত্র ঠাকুরের আশীর্বাদ লাভে ধন্য হয়েছিলেন। একদিন –

ঠাকুর এলেন সুরেন্দ্রনাথের বাড়ি –

খবর পেয়ে নরেন এল ঠাকুরকে গান শোনাতে

৯২

গান শুনে ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হয়ে পড়েন। পরে নরেনকে বললেন –

(ক্রমশঃ

একদিন নরেন্দ্রনাথ কয়েক জন বন্ধুসহ দক্ষিণেশ্বরে এসে উপস্থিত হল

নরেন, তুই এসেছিস! আয় আয়

এবার একটা গান শোনা

গান থামলে ঠাকুর নরেনকে নিয়ে বারান্দার দিকে চললেন

আয় না বলছি

আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন?

জনশূন্য বারান্দায় এসে দরজাটা বন্ধ করে দিলেন -

!?

পরক্ষণেই—

এতদিন পরে আসতে হয়? আমি তোমার জন্য কি ভাবে অপেক্ষা করে আছি তা একবার ভাবতে নেই?

বিষয়ী লোকের কথা শুনতে শুনতে কান ঝলসে গেছে।

ঠাকুর অশ্রু বিসর্জন করতে লাগলেন। যেন কতদিন পরে তাঁর প্রিয়জনের দেখা পেয়েছেন

!?

আমি জানি প্রভু, তুমি সেই পুরাতন ঋষি, নররূপী নারায়ণ, জীবের দুর্গতি নিবারণ করতে পুনরায় শরীর ধারণ করেছ...
এ আবার কি পাগলামী!

পরে—
নে নে এগুলো খা

খাবারগুলো আমাকে দিন, আমি বন্ধুদের সঙ্গে ভাগ করে খাই।
ওরা খাবে এখন, তুই খা

বল, তুই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আর একদিন আসবি। একা আসিস কিন্তু
আসব

নরেন্দ্রনাথ ফিরে আসে তার বন্ধুদের মাঝে—
আচ্ছা, আপনি ভগবানকে দেখেছেন?
বলিস কি! দেখেছি মানে, তোকে যেমন দেখেছি তেমনি স্পষ্ট ভাবে দেখেছি; যদি চাও তো তোমাকেও দেখাতে পারি

গভীর শ্রদ্ধা আর চিন্তা নিয়ে নরেন বাড়ি ফেরে—
এ ব্যক্তি উন্মাদ হলেও মহা ত্যাগী মহা পবিত্র এবং মহাসাধক।

৯৪

(ক্রমশঃ)

মাসাধিক কাল পরে নরেন্দ্রনাথ আবার এসে উপস্থিত হল দক্ষিণেশ্বরে—

এত দিন পরে তোর এখানকার কথা মনে পড়লো!

ঠাকুর নরেনকে ঘরে নিয়ে এসে বসান

হঠাৎ ঠাকুর নরেনের দেহে তাঁর দক্ষিণ পদ স্থাপন করলেন

সঙ্গে সঙ্গে নরেন দেখল—ঘর বাড়ি-গাছ পালা সব যেন বেগে ঘুরতে ঘুরতে মহাশূন্যে বিলীন হয়ে যাচ্ছে—হারিয়ে যাচ্ছে তার নিজস্ব সত্তা—সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে তার আমিত্ব এক সর্বগ্রাসী মহাশূন্যে একাকার হতে ছুটে চলেছে—

চিৎকার করে ওঠে নরেন

ওগো, তুমি আমায় একি করলে, আমার যে বাপ মা আছেন!

নরেনের চিৎকার শুনে ঠাকুর তার বুকে হাত বুলিয়ে দেন মুহূর্তে অদৃশ্য হয় সেই অত্যদ্ভুত দৃশ্য

হাঃ-হাঃ-হাঃ তবে এখন থাক। একেবারে কাজ নেই।

ধীরে ধীরে ওকে আমিত্ব পাশ হতে মুক্ত করে আনতে হবে অসীমের কোলে। এসব তাড়াতাড়ি করলে হবে না

আশ্চর্য, এ কি করে সম্ভব! একি মায়া না স্বপ্ন?

আমার মত প্রবল ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন মনের দৃঢ়সংস্কারময় গঠন এই ব্যক্তি ইচ্ছামাত্র ভেঙেচুরে কাদার তালের মত করে আপন ভাবে ভাবিত করতে পারেন, ইনি ত সামান্য নন!

নে এগুলো খেয়ে নে।

৯৬

আবার আসিস্ কিন্তু। দেরী করবি না।

আচ্ছা

(ক্রমশঃ)

ঠাকুরের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা আর অত্যুগ্র কৌতূহলে নরেনকে দক্ষিণেশ্বরে টেনে আনে। ঠাকুরও তাকে পেয়ে খুবই উল্লাসিত হন

চল, ঘরে গিয়ে বসবি চল। অনেক দিন বাদে এলি...

আজ নরেন মনকে দৃঢ় ও সতর্ক করে নিয়ে ঠাকুরের সম্মুখীন হয় —

আজ আমি কিছুতেই বশ হব না। দেখি ইনি কি করে আমাকে বশীভূত করেন।

হঠাৎ ঠাকুর ভাবাবেশে উঠে এসে নরেনকে স্পর্শ করেন— নরেন হারিয়ে ফেলে তার বাহ্যসংজ্ঞা

তখন ঠাকুর তাকে জিজ্ঞাসা করেন

বল তুমি কে? কোথা থেকে এসেছো? কেনই বা এসেছো?

ঐ অবস্থায় নরেন ঠাকুরের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যায়

আমি সেই সপ্ত ঋষির একজন। তোমাকে সাহায্য করতে এবং জীবের কল্যাণের জন্যই আমার আগমন

কত দিন থাকবে?

আমার আরাধ্য কর্ম শেষ হলে এবং এখানে যখন নিজের স্বরূপ বুঝতে পারবো তৎক্ষণাৎ এ শরীর ত্যাগ করে চলে যাব।

ঠাকুরের করস্পর্শে নরেন্দ্রনাথ আবার সংজ্ঞা লাভ করে জেগে উঠে।

এ আমি কোথায়?

এই তো তুই এখানে আমার কাছেই আছিস

একবার বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ঢাকায় তাঁর ঘরে ঈশ্বর চিন্তায় মগ্ন হয়ে আছেন। এমন সময়—

ঘরে ঠাকুরের আবির্ভাব

একি আপনি এখানে! কি করে?

ঠাকুরের হাত-পা টিপে দেখতে লাগলেন বিজয়কৃষ্ণ। তিনি যা দেখছেন, তা সত্য কিনা

কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর অদৃশ্য হয়ে যান

কিছুকাল পরে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী দক্ষিণেশ্বরে আসেন ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করতে —

বল কি!

দেশ বিদেশ ঘুরে অনেক সাধু মহাত্মা দেখলাম কিন্তু এমনটি আর কোথাও দেখলাম না। এখানে ভাবের এক পূর্ণ প্রকাশ দেখছি

ঢাকাতে সেদিন আপনার যে রূপ দেখেছি, তাতে আপনি না বললেও আমি শুনছি না। অতি সহজ হয়েই যে আপনি সব গোল করেছেন। কাছেই দক্ষিণেশ্বর। ঘরের পাশে এভাবে এত সহজে আপনাকে পাওয়া যায় বলেই আমরা আপনাকে বুঝলাম না। তাই আমরা ছুটে মরি দূর দূরান্তে দুর্গম পথে

(ক্রমশঃ)

বাল্যকাল থেকেই ঠাকুর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নাম শুনে আসছেন। তাই একদিন তাঁকে দেখতে যাবার ইচ্ছা হল

হ্যাঁগো, চলনা বিদ্যাসাগরকে একবার দেখে আসি। আমার ওকে দেখতে খুব ইচ্ছা হচ্ছে

বেশ তো, চলুন না একদিন

ঠাকুর চললেন বিদ্যাসাগর দর্শনে-

ওরে মা, মাগো, পণ্ডিতের সঙ্গে দেখা করতে চলেছি। আমার মুখ রাখিস মা।

ঠাকুরকে নিয়ে গাড়ি এসে থামে বিদ্যাসাগরের বাড়ির দরজায়

জামার বোতাম খোলা রয়েছে, এতে কিছু দোষ হবে না তো?

না না, ওতে আপনার কিছু হবে না।

আসুন আসুন...

অনেক খাল বিল পেরিয়ে আজ সাগরে এসে মিললুম

বেশ, তো, এবার খানিকটা নোনা জল খেয়ে যান

না গো নোনা জল কেন? তুমি তো অবিদ্যার সাগর নও, তুমি যে বিদ্যার সাগর, তুমি ক্ষীর সমুদ্র

তোমার কর্ম সাত্ত্বিক কর্ম সত্ত্বগুণ থেকে দয়া হয় দয়ার জন্যে যে কর্ম তা সাত্ত্বিক কর্ম বটে। কিন্তু এ রজোগুণ —সত্ত্বের রজ এতে দোষ নেই

তোমার অন্নদানে, বিদ্যাদান সেও ঐ দয়া থেকে

নিষ্কাম হয়ে করতে পারলে ঐ তেই ভগবান লাভ হয়। তোমার কর্ম নিষ্কাম তুমি তো সিদ্ধ

আমি সিদ্ধ হলাম কেমন করে?

আলু পটল সিদ্ধ হলে তো নরম হয়, তুমি তো তেমনি নরম। তোমার অত দয়া

কলাই বাটা সিদ্ধ তো শক্তই হয় জানি

তুমি দড়কচা পণ্ডিত নও। শকুনি খুব উঁচুতে উঠে কিন্তু নজর থাকে ভাগাড়ের দিকে। যারা শুধু পণ্ডিত শুধুই পণ্ডিত কিন্তু তাদের আসক্তি শুধু ঐ কামিনীকাঞ্চনে। তারা শকুনির মত পচা মড়া খুঁজে বেড়াচ্ছে

আসক্তি অবিদ্যার সংসারে। দয়া, ভক্তি বৈরাগ্য বিদ্যার ঐশ্বর্য

বিদ্যাসাগর তন্ময় হয়ে শোনেন ঠাকুরের কথা

ঈশ্বর সর্বভূতে বিরাজমান

ঈশ্বর যদি সর্বভূতে আছেন তবে কাউকে বেশী শক্তি কাউকে কম শক্তি দিয়েছেন কেন?

১০০

তিনি বিভুরূপে সর্বভূতে আছেন। তবে পাত্রবিশেষে শক্তির মান বাড়ে কমে।

যা বললুম, বলা বাহুল্য। তুমি সব জান। তবে খবর নেই। বরুণের ভাণ্ডারে কত কি রত্ন আছে বরুণরাজার তা খবর নেই। অন্তরে সোনা আছে, কিন্তু মাটি চাপা

ঠাকুর নরেনকে প্রাণাধিক ভালবাসেন। তাকে এক-দিন না দেখলে ঠাকুর উতলা হয়ে উঠেন-

হ্যাঁ গো, নরেন এখানে অনেকদিন আসেনি, সে কেমন আছে? তাকে একবার আসতে বলো না

আচ্ছা বলবো

সে দিন রাত্রে, সবাই শুয়ে পড়েছে। এমন সময়—

ওগো তোমরা ঘুমুলে নাকি?

আজ্ঞে না!

দেখ, নরেনের জন্যে আমার প্রাণের ভিতরটা যেন গামছা নিংড়ানোর মত মোচড় দিচ্ছে। তাকে একবার ডাকতে পার?

এখন তো রাত্রি! ভোর হোক, সকালে আমি তাকে খবর দেব

পরদিন সকালে-

এত করে কাঁদলুম, তবু নরেন এলো না। সে এত বোঝে আর আমার মনটাই বোঝে না।

বুড়ো মিনসে আমি পরের একটা ছেলের জন্যে এভাবে কাঁদছি, লোকে কি বলবে? তোমরা আপনার লোক, তোমাদের কাছে লজ্জা নেই কিন্তু অন্যে কি বলবে?

ঠাকুরের জন্মোৎসব। কিন্তু নরেন এখনও আসেনি

তাই তো, নরেন এখনও এলো না!

অবশেষে তাকে আসতে দেখে ঠাকুর উল্লাসিত হয়ে উঠেন

!

নরেন-নরেন তুই এসেছিস! এত দেরী কেন রে?

ঠাকুরের তীব্র নরেন প্রীতি দেখে জনৈক ভক্ত বললেন

অধীর হব না, বল কি? লেখাপড়ায় গানে কথায় নরেন সেরা ছেলে। রাত-ভর ধ্যান করে, সে কি যেসে। তার ভিতর এতটুকু মেকি নেই।

দেখুন ওর সামান্য পড়াশুনা। ওর জন্য এত অধীর হন কেন?

নরেন্দ্রনাথ কিন্তু ঠাকুরকে সহজে মানতে রাজি নয়–

আপনি ঈশ্বরের রূপটুপ যা দেখেন সবই মনের ভুল।

ওরকম বলিস নি। সে যে কথা কয়

কথা কয় না কচু

বলিস কিরে! মা যে স্পষ্ট চোখের সামনে এসে দাঁড়ান, হাঁটেন, চলেন

সবই আপনার খেয়াল। মাথার গরমে আপনি ছায়া দেখেন। হাওয়ায় কিসের শব্দ হয়, ভাবেন, ছায়া কথা কইছে।

হবে না কেন? পশ্চিমের বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে, অনেক জায়গায় এমনি করে প্রতারণা করে। আপনিও প্রতারিত হচ্ছেন না তা কে বলতে পারে? আপনার যে চোখকানের ভুল হচ্ছে না তা কে প্রমাণ করতে পারে?

ঠাকুর অধীর হয়ে ছুটে যান ভবতারিণীর কাছে–

মা একি হলো? এসব মিছে? নরেন কেন এমন কথা বললে? তুই কি শুধুই পাথরের মূর্তি?

ওর কথা শুনিস নি। কিছুদিন পরে ওই নিজে ঈশ্বরীয় রূপ দেখতে পাবে। তখন সব কথাই সত্য বলে মানবে।

শালা, তুই আমাকে অবিশ্বাস করিয়ে দিয়েছিলি। চলে যা। এখানে আর আসিস না

(ক্রমশঃ)।

ঠাকুরের সীমাহীন ভালবাসা দেখে একদিন নরেন বলে—

আমায় যে আপনি এত ভালোবাসেন কিন্তু এ ভালবাসার পরিণাম কি? ভরতরাজা হরিণ ভাবতে ভাবতে হরিণ হয়েছিলেন আপনারও না সেরকম কোন দশা হয়।

অ্যাঁ, সে কিরে! তুই মাঝে মাঝে এমন কথা বলিস-যার জন্য বিষম জ্বালা হয়

আমি যা বলি তা ঠিকই

তাহলে কি হবে! আমি যে তোকে আলাদা ভাবে ভাবতেই পারি না আমায় কি করতে হবে বলেদে

ঠাকুর আবার ছুটে যান মার কাছে—জেনে নেন সব ব্যাপারটি—

যা শালা, তোর কথা আর নিই না। মা সব বলে দিয়েছে

কি বলে দিয়েছে?

মা বলেছে, তুই ওকে সাক্ষাৎ নারায়ণ বলে জানিস। তাই অত ভালবাসিস। যেদিন ওর মধ্যে নারায়ণ দেখতে পাবি না সেদিন ওর মুখ দর্শণ তোর অসহ্য হবে

!

আমার ভরত রাজার মত দশা হবে বলছিস? নারায়ণ ভেবে নারায়ণকে ভালবেসে যে পাড়ি জমাতে পারে তার আর পারাপারের ভয় কি?

ইতিমধ্যে নরেন্দ্রনাথের পিতা দেহত্যাগ করেন। সংসার অচল হয়ে উঠে। চাকরির সন্ধানে অনেক অফিসে বৃথা ধর্ণা দেয়

ঘুরতে ঘুরতে নরেন এসে উপস্থিত হয় দক্ষিণেশ্বরে

আয় আয় নরেন আয়। ঈশানকে তোর কথা জানিয়েছি। অনেকের সঙ্গে ওর আলাপ আছে। একটা কিছু জোগাড় হয়ে যেতে পারে।.আচ্ছা এখন একটা গান গা দেখি—

গান শেষ হলে নরেন বলে —

বলুন তো ঈশ্বর দয়াময় হলেন কি ভাবে? যদি দয়াময় হন তবে এত দুঃখ কেন?

ওরে যে বিচার করার শক্তি আমাদের নেই। যার যে টুকু কর্ম-ফল, সে ততটুকু ভোগ করবে

একদিন মাতা ভুবনেশ্বরী দেবী নরেনকে ডেকে বলেন-

ওরে বিলে, আমাকে একখানা কাপড় কিনে দিতে পারিস? পুরানোটা একদম ছিঁড়ে গেছে

নিজের অসহায়তার কথা ভেবে নরেন নিজেকে ধিক্কার দেয়-

অন্তর্যামী ঠাকুরের কিছুই অজানা থাকে না। নরেন আসতে ঠাকুর বলেন-

শোন, এই মিছরির থালা আর গরদখানা নিয়ে যা, তোর মাকে দিস। তার আহ্নিক করার চেলি নেই।

এতে নরেন্দ্রনাথ যেমন অবাক হয় তেমনি লজ্জা পায়

না, ও আমি নিতে পারবো না!

অগত্যা ঠাকুর গোপনে রামলালকে ডাকেন-

রামলাল, তুই এগুলো চুপিচুপি নরেনের মাকে দিয়ে আয় তো। যা শিগগীর।

১০৪

(ক্রমশঃ)

অনেক চেষ্টা করে কোথাও একটা চাকরি জোটাতে পারে না। ঘুরতে ঘুরতে চলে আসে দক্ষিণেশ্বরে।

আমি আর মা-ভাই-বোনদের দুঃখ দেখতে পাচ্ছি না। মাকে বলে আপনি এর একটা বিহিত করে দিন না

ওরে ওসব নিয়ে আমি যে কথা কইতে পারি না

তুই তো মাকে মানিস না —সেই জন্য এত কষ্ট। আচ্ছা, আমি বলছি, আজ মঙ্গলবার-ভাল দিন। মার কাছে গিয়ে যা চাইবি মা তোকে তাই দেবে।

নরেন মন্দিরে মাতৃমূর্তির অপূর্ব রূপ দেখে ভুলে যায় তার সব বাসনা কামনা। ভক্তিতে বিহ্বল হয়ে যায়। বলে উঠে—

অন্য কিছু চাই না মা! শুধু জ্ঞান দাও, বিবেক দাও, ভক্তি দাও, বৈরাগ্য দাও।

কিরে মার কাছে গিয়ে সংসারের অভাব দূর করার প্রার্থনা করেছিস তো?

না তো ভুলে গেছি! তাই তো, এখন কি করি?

যা-যা আবার যা!

নরেন আবার ছুটে যায় মন্দিরে এবং প্রার্থণা করে

মা জ্ঞান দাও, ভক্তি দাও, বৈরাগ্য দাও।

কিরে, এবার ঠিক ঠিক চেয়েছিস তো ?

না ওসব কথা মুখে এলো না

দূর ছোঁড়া, নিজেকে একটু সামলে-সুমলে নিয়ে ঐ প্রার্থনাটি করতে পারলি না? পারিস তো আর একবার যা। এটাই কিন্তু শেষবার এমন মহা সুযোগ আর আসবে না!

কি, এবার নিশ্চয়ই ঠিকমত চাইতে ভুল করিস নি?

না, চাইতে পারলুম না

যা মা বলে দিয়েছে—তোদের কোন দিন মোটা ভাত-কাপড়ের অভাব হবে না

কিছুদিন পর। নরেন আসতেই ঠাকুর তার গা ঘেঁষে একেবারে কোলের উপর বসেন –

দেখছ কি? এটা আমি আবার ওটাও আমি। সত্যি বলছি ওতে আমাতে কোন তফাৎ নেই

আমাকে একটু তামাক সেজে দাও তো খাবো

আচ্ছা, দিচ্ছি

১০৬

(ক্রমশঃ)

খা, এবার তুই আমার হাতেই খা।

নন্-না!

তোর যে ভারী হীন বুদ্ধি, তুই আমি কি আলাদা?

কি-কিন্তু এটা কি ঠিক হচ্ছে?

কি বলছি তবে? এটাও আমি ওটাও আমি। নে খা।

অগত্যা নরেন ঠাকুরের হাতেই কয়েকটা টান দেয়!

পরে ঠাকুর আবার তামাক খেতে উদ্যত হতেই --

ও কি করছেন আপনি? হাতটা ধুয়ে তামাক খান!

দূর শালা, তোর তো ভারী ভেদবুদ্ধি!

কামারহাটি থেকে ঠাকুরকে প্রায়ই দেখতে আসতেন অঘোরমণি নাম্নী জনৈক ভক্তিমতি মহিলা

কি গো, এসেছো? আজ আমার জন্যে কি এনেছো?

একে কত লোক কত ভাল ভাল জিনিস খাওয়াচ্ছে। আমি কেমন করে তাঁকে আমার এই তিন পয়সার খারাপ সন্দেশ দিই!

তুমি পয়সা খরচ করে সন্দেশ আনো কেন? নাড়ু করে রাখবে, না হয় যা তুমি রাঁধবে—লাউশাক, ডাঁটাচচ্চড়ি, সজনে খাঁড়ার তরকারি, ঐই নিয়ে আসবে

ভাল সাধু দেখতে এসেছি, কোথায় ধর্মকর্মের কথা বলবে, তা নয় কেবল খাই খাই! আমি গরীব লোক কোথা থেকে অত খাওয়াতে পারবো

তাঁর ইষ্টদেবতা বাল গোপালের পূজা করে অঘোরমণি

এমন সময়—

আরে, এ সময় উনি কোথা থেকে এলেন!

হঠাৎ ব্রাহ্মণী ঠাকুরকে ধরতেই তাঁর ভিতর থেকে বেরিয়ে

একি, উনি গেলেন কোথায়!

(ক্রমশঃ)

!

মা ননী দাও

বাবা আমি দুঃখিনী কাঙালিনী ননিরমনী কোথায় পাবো! এই নাও শুকনো নারকেল নাড়ু। অপরাধ নিওনা

জপতপ সব পড়ে রইল। সকাল হতেই ব্রাহ্মণী ছুটে চলল দক্ষিণেশ্বরে—

গোপালে-গোপাল

ঊর্দ্ধশ্বাসে ঘরে ঢোকে অঘোরমণি। দেখে তাঁর গোপাল ঠাকুরের দেহে মিলিয়ে গেল—

ঠাকুর ভাবাবেশে তাঁর কোলের উপর উঠে বসেন

গোপাল, আমার গোপাল। এতদিন কোথায় ছিলি?

কিছুক্ষণ পরে ঠাকুরকে ছেড়ে আনন্দে নৃত্য করতে থাকে অঘোরমণি

ব্রহ্মা নাচে বিষ্ণু নাচে...

দেখে দেখে ওর হৃদয় আনন্দে ভরে গেছে ওর মনটা এখন গোপাল-লোকে চলে গেছে।

ইচ্ছানুসারে ঠাকুর একবার এলেন কামারহাটিতে-

ওহো, আমার কি সৌভাগ্য স্বয়ং গোপাল আজ আমার এই গরীবের কুটিরে পায়ের ধুলো দিয়েছে

খাওয়া দাওয়ার পর দোতলার একটি ঘরে তাঁদের শোবার ব্যবস্থা হল

উঃ, এত দুর্গন্ধ আসছে কোথা থেকে!

?

আপনি এখানে কেন এসেছেন? আপনি চলে যান। আপনার দর্শনে আমাদের কষ্ট হচ্ছে।

একি, তুমি এত রাত্রে চললে কোথায়?

পরে বলবো, এখন চলে আয়

এখানে দুটো ভূত আছে। সাহেবদের ফেলে দেওয়া হাড়গোড় শুঁকে ওরা জীবন ধারণ করে আর ঐ ঘরে থাকে। বুড়িকে বলে কাজ নেই, তাকে ঐ বাড়িতেই থাকতে হবে—শুনলে ভয় পাবে

একবার ঠাকুর দেখতে এলেন পন্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণিকে, শোনালেন অমৃতময় বাণী

শ্রীশ্রীজগদম্বার কাছ থেকে সাক্ষাৎ ক্ষমতা প্রাপ্ত ব্যক্তিই ধর্মপ্রচারে সক্ষম। নয়তো লোকে তার কথা শুনবে কেন?

আমি একটু জল খাব

এই নিন, জল

তৃষ্ণার্ত ঠাকুর অনেক চেষ্টা করেও ঐ জল পান করতে পারলেন না

বোধ হয় ওতে কিছু পড়েছে! আমি আরএক গ্লাস জল এনে দিচ্ছি

আমি যতদূর দেখেছি, আগের জলে কোন কিছু পড়েনি! তবে উনি খেলেন না কেন?

বেশ দেখলাম পন্ডিতকে। চল নরেন এবার ফেরা যাক

ঠাকুর জলটা কেন মুখে দিতে পারলেন না! ব্যাপারটা জেনে যেতে হবে

আপনি যান, আমার কাজ আছে, একটু পরে যাচ্ছি

আচ্ছা, যার দেওয়া জল ঠাকুর খেতে পারলেন না, তার চরিত্র সম্বন্ধে আপনি কিছু জানেন?

সে কথা আর বলবেন না! আমি তার ছোট ভাই — বড় ভাইয়ের দোষের কথা বলি কি করে!

একদিন ঠাকুর বারান্দায় দাঁড়িয়ে কথাবার্তা বলছেন এমন সময়

জুড়িগাড়ি হাঁকিয়ে এ সময় আবার কে আসছে!

তাদের দেখে ঠাকুর তাড়াতাড়ি ঘরে এসে ঢোকেন

কি হলো, আপনি চলে এলেন যে?

যা, শিগগীর যা! ওরা এখানে আসতে চাইলে বলবি দেখা হবে না

কাকে চান?

এখানে একজন সাধু থাকেন না? আমরা তাঁর কাছে এসেছি।

আমার এক আত্মীয়ের ভীষণ অসুখ করেছে। তাই উনি যদি দয়া করে কোন অসুধ দেন…

আপনারা ভুল শুনেছেন ইনি কাউকে অসুধ দেন না। যিনি অসুধ দেন তিনি ঐ পঞ্চবটীর কুটিরে থাকেন। গেলেই দেখতে পাবেন

ওদের মধ্যে কি একটা তমগুণ দেখলুম – আর ওদের দিকে চাইতে পারলুম না। কথা কইব কি, ভয়েই পালিয়ে এলুম

১১২

[ক্রমশঃ]

ঠাকুরের আমন্ত্রণে একদিন গিরীশ ঘোষ দক্ষিণেশ্বরে আসেন

আরে, গিরীশ এসেছিস! আয় আয়, ওরে গিরীশকে তামাক দে

এই যে ঠাকুর, কেন যে তুমি বারবার আমার মত একটা নাস্তিককে দেখতে চাও, বুঝতে পারি না। তোমার ঐ ঈশ্বর দেবতাকে আমি মানি না। ও সব বুজরুকি

বল কিগো! তা মানো না বইকি! তা না হলে অমন লেখা লিখলে কি করে? সবই তো ওঁকে উদ্দেশ্য করেই লিখেছিলে গো!

তোমার চৈতন্যলীলার অমন গান-প্রহ্লাদ চরিত্রের অমন সব ফোটালে কি করে?

কেউ আমটি খেয়ে মুখটি মুছে আঁটি ফেলে দেয়-কেউ পাঁচজনকে দেয়। তুমি পাঁচজনকে দেবে, পরের জন্যে রাখবে

আমার কি ক্ষমতা আছে?

তুমি মার নামে বিশ্বাস রাখ, তাহলেই সব হয়ে যাবে

কিন্তু আমি যে পাপী, আমার কথা কি মা শুনবেন?

নিশ্চয়ই শুনবেন। যে সর্বদা পাপ-পাপ করে, সে শালা পাপীই হয়ে যায়

আপনি আমাকে আশীর্বাদ করুন

আমি আশীর্বাদ করার কে? যা করার সবই মা করছেন। আমি কি? আমি খাই, দাই তাঁর নাম করি। চাই আন্তরিকতা, চাই বিশ্বাস। মার নামে বিশ্বাস কর,-সব হবে

কিছুদিন পর—

কি হলো অমন হাঁপাচ্ছিস্ কেন?

গিরীশ! মাতাল গিরীশটা আবার আসছে! ছি-ছি, মায়ের পবিত্র স্থান অনাচারে একেবারে নষ্ট করে দিলে!

ওরে ও কথা বলিস নি। ও যে ভক্ত ভৈরব। যা যা, শিগ্‌গীর ডেকে নিয়ে আয় গে যা।

ঐ যে, আমার ভক্ত ভৈরব কেমন টলতে টলতে এদিকেই আসছে

এই যে গিরীশ, এবার মদ খাওয়াটা একটু ছাড়।

ও আমি পারবো না।

বেশ, এবার যখন তুমি মদ খাবে তখন আমার নামে করে খেও

এবার থেকে তাই করে গিরীশ। মদ খাওয়ার ঝোঁকও অনেক কমে যায়—

এবার থেকে রোজ একটু মার নামে জপ কর। তাতে তোর ভাল হবে

ও আমার দ্বারা হবে না, আমার সময় কোথায়?

আচ্ছা, তা যদি না পার, তবে খাবার আর শোবার আগে একবার তাঁর স্মরণ নিও

আমার তো খাবার কোন নির্দিষ্ট সময় নেই আর শোবার সময়ও হজারো চিন্তা মাথার মধ্যে ঘুরতে থাকে

বেশ, তবে তুই আমায় বকলমা দে।

হ্যাঁ, আমি তোমায় বকলমা দিলাম! তুমিই আমার অগতির গতি, তুমিই আমার হয়ে সব কর

১১৪

[ক্রমশঃ]

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে ঠাকুর মারাত্মক গলরোগে আক্রান্ত হলেন এবং ক্রমশ তা বৃদ্ধি পেতে লাগল —

গলার ব্যাথার জন্য তো আপনার খুব কষ্ট হচ্ছে !

হ্যাঁ গো, এর জন্যে কত অসুধ-বিষুধই তো খাচ্ছি। কিন্তু কিছুতে কিছু হচ্ছে না।

মশাই, শুনেছি আপনার মত সিদ্ধ পুরুষরা ইচ্ছা মাত্রই শারীরিক রোগ আরাম করতে পারে তা আপনি একবার সেই চেষ্টা করে দেখুন না

তুমি পন্ডিত হয়ে একথা কি করে বল্লে গা ? যে মন একবার সচ্চিদানন্দকে দিয়েছি সেখান থেকে তুলে এনে এ ভাঙা হাড়-মাসের শরীরের উপর দিতে কি আর প্রবৃত্তি হয় ?

ঠাকুরের অপূর্ব দেহভাবের কথা ভাবতে ভাবতে বাড়ি ফেরে পান্ডিত

ঠাকুরের কষ্ট দেখে নরেন ও অন্যান্য শিষ্যবৃন্দ বেশ বিচলিত হয়ে পড়ে—

দেখ নরেন, ঠাকুরের কষ্ট আর চোখে দেখা যায় না। এর কি কোন প্রতিকার নেই?

না। ডাক্তার বলেছেন এটা নাকি ক্যান্সার। এখন তাঁর সম্পূর্ণ বিশ্রাম দরকার

এত কষ্ট তবুও তাঁর কথা বলার বিরাম নেই!

ডাক্তারই কথা বলতে বারণ করছেন, অথচ ঐ ডাক্তারের সঙ্গেই ঘন্টার পর ঘন্টা কথা বলে চলেছেন

আমি জানি, উনি ইচ্ছা করলে নিজেই নিজের রোগের প্রতিকার করতে পারেন। চল আজ বলতে হবে

দেখুন আপনি ভাল করে কথা বলতে খেতে পারছেন না। আমরা আপনার এ কষ্ট দেখতে পারছি না। যে করেই হোক আপনাকে নিজেই এর প্রতিকার করতে হবে।

আমার কি ইচ্ছা রে যে আমি রোগে ভুগি। আমি তো মনে করি সারুক, কিন্তু সারে কই। সবই যে মার হাত।

তবে মাকে বলুন সারিয়ে দিতে। তিনি আপনার কথা শুনবেনই শুনবেন

তোরা তো বলছিস্। কিন্তু ও কথা যে মুখ দিয়ে বেরোয় না

ও কথা শুনছি না। আপনাকে বলতেই হবে। আমাদের জন্যে বলতে হবে

আচ্ছা তোরা এখন যা, দেখি কি করতে পারি।

ঘন্টাখানেক পর

মাকে বলেছিলেন? মা কি বললেন?

মাকে তো বললুম

১১৬

মা এইটের দরুণ কিছু খেতে পারছি না। যাতে দু'টো খেতে পারি— করে দে

[ক্রমশঃ]

তোদের কথায় মাকে আমার খাওয়ার অসুবিধার কথা জানাতেই

তোদের সকলকে দেখিয়ে মা-বললেন...

কেন, এই যে এত সুখে খাচ্ছিস্

আমি আর লজ্জায় কথাটি কইতে পারলুম না

রোগাক্রান্ত ঠাকুর তখন কাশীপুরের বাড়িতে। পাশেই বাগান।

সেখানে খেজুর গাছে বাঁধা আছে রসের হাঁড়ি। নরেন সহ কয়েকজন শিষ্য মিলে ঠিক করলে তারা ঐ রস চুরি করে খাবে

তাহলে ঐ কথাই রইল। কাজটা চুপি চুপি হাঁসিল করতে হবে

কিন্তু তারা জানে না যে ঐ গাছের নীচে বসে আছে সাক্ষাৎ যম

রোগ শয্যায় শায়িত অন্তর্যামী ঠাকুর সবই জানতে পারলেন এবং ভক্তগনের বিপদ আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন হলেন—

!

নাঃ, ওদের রক্ষা করতেই হবে

কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর ঘরে ফিরে আসেন—

হ্যাঁগো, তুমি না উঠে হাঁটা চলা করতে পার না, আর সেই তুমি ওভাবে দৌড়ে কোথায় গেছিলে ?

দেখলুম নরেন, লেটো ওরা সব চুরি করে খেজুর রস খেতে যাচ্ছে। আরও দেখলুম— ঐ খেজুর গাছের নীচে বসে আছে একটা কেউটে সাপ, আমি তাড়াতাড়ি গিয়ে সাপটা তাড়িয়ে না দিয়ে এলে ওরা নির্ঘাৎ ঐ সাপের কামড়ে মারা পড়তো। তাই..

?!

একদিন ভক্তরা ঠাকুরের ফটো তোলবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করলে ঠাকুর বললেন—

আমার ফটো তুলবি? বেশ তো, চল, এইবেশেই তুলবো।

ফটো তুলতে গিয়ে ঠাকুর সমাধিস্থ হয়ে যান—

এ কিরে বাবা! মরে-টরে গেল নাকি? পালাই বাবা, শেষে পুলিশ হেপাজতে না পড়ি!

ঠাকুরের সমাধিভাব দেখে ক্যামেরাম্যান ভয় পেয়ে গেল—

পরে ঠাকুর বললেন—

দেখবি, কালে এই ছবিই ঘরে ঘরে পুজো হবে

১১৮

[ক্রমশঃ]

শ্যামপুকুরে থাকাকালীন কালীপূজার আগের দিন ঠাকুর বললেন

শোন, কাল কালীপূজা করতে হবে। পূজার সব উপকরণ যোগাড় করে রাখিস

আচ্ছা

পরদিন– কালীপূজার উপকরণ সব প্রস্তুত করে ভক্তরা অপেক্ষা করছে, কখন ঠাকুর আদেশ করবেন। কিন্তু ঠাকুর কিছুই না বলে স্থিরভাবে বিছানায় বসে আছেন।

কি হলো নরেন, উনি তো কোন কিছুই বলছেন না!

ঠাকুর বোধহয় সমাধিস্থ হয়ে আছেন

পূজার সময় তো শেষ হতে চলল! আর কখন পূজা হবে?

কিন্তু গিরীশ ঘোষ তখন ভাবতে লাগলেন–

হুম, ঠাকুরের নিজের কালীপূজা করার কোন প্রয়োজন নেই। যদি অহেতুকী ভক্তির প্রেরণায় তাঁর পূজা করার ইচ্ছা হয়ে থাকে– তবে উনি তা না করে স্থির হয়ে বসে আছেন কেন? তবে কি তাঁর শরীর রূপ জীবন্ত প্রতিমায় জগদম্বার পূজা করে ভক্তগণ ধন্য হবে বলে এই পূজার আয়োজন? নিশ্চয়ই তাই– তবে আর কি...

তখন আর দেরী না করে গিরীশচন্দ্র পূজার ফুলগুলো ঠাকুরের পায়ে পুষ্পাঞ্জলি দিতে লাগলেন– ঠাকুর গভীর সমাধিতে মগ্ন হলেন। দেখা গেল, যেন ঠাকুরের মধ্যে জগদম্বার জ্যোতির্ময়ী মূর্তি তাদের সম্মুখে আবির্ভূতা হয়েছেন। তখন উল্লাসে সকলেই জগদম্বা রূপী ঠাকুরকেই পূজা করতে লাগল।

ঠাকুরের অসুস্থতা ক্রমশই প্রকট হয়ে উঠতে লাগল। একদিন—

যোগেন, পাঁজিটা নিয়ে আয় তো

আচ্ছা

এবার পঁচিশে শ্রাবণ থেকে তিথি নক্ষত্র সব পড়ে যা

পঁচিশ-ছাব্বিশ-সাতাশ....শ্রাবণ সংক্রান্তি-একত্রিশে শ্রাবণ...

রাখ, আর পড়তে হবে না

শ্রাবণ সংক্রান্তি। বেশ রাত্রি, বেশ তিথি, ঝুলন পূর্ণিমা

কেন?

আচ্ছা, নরেনকে ডাকতো, তোরা সব নীচে যা আর দেখিস, কেউ যেন ধারে কাছে না থাকে।

আমাকে ডাকছিলেন?

হ্যাঁ, আয় নরেন আমার কাছে বোস

ঠাকুর স্থির প্রশান্ত দৃষ্টিতে তাকালেন নরেনের দিকে। পরক্ষণেই নরেন অনুভব করলো ঠাকুরের দেহ থেকে একটা তড়িৎ তার সারা দেহকে যেন আলোড়িত করে তুলছে।

নরেন দেখল সমস্ত জগৎ সংসার পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে সেই দৃষ্টি

হঠাৎ চমক ভেঙে নরেন দেখে, ঠাকুর কাঁদছেন

আমার সর্বস্ব তোকে দিয়ে আজ আমি ফকির হলুম

তুই সকলের আশ্রয় হবি। তোর হাতে সকলের ভার দিয়ে গেলুম। কাজ ফুরুলে যখন তুই বুঝতে পারবি, তুই সত্যি কে, তখন ফিরে যাবি স্বধামে

(ক্রমশঃ)

আজ ১২৯৩ সাল শ্রাবণ-সংক্রান্তি। শ্রীমা সকাল থেকেই নানা অশুভ লক্ষণের সম্মুখীন হচ্ছেন

একি! ছাদে যে শাড়িটা শুকুতে দিয়েছিলাম কোথায় গেল!

যাঃ কুঁজোটা গেল!

এদিকে আজ সারাদিনই ঠাকুর সমাধিস্থ হয়ে আছেন। কিছুই খাওয়ানো যাচ্ছে না

কেমন দেখলে অতুল?

নাঃ, কোন আশা নেই

নিস্পন্দিত ঠাকুরকে ঘিরে উদ্বেগাকুল ভক্তবৃন্দ—

ঠাকুরের অবতারত্ব সম্বন্ধে তখনও নরেন্দ্রনাথের মনে অবিশ্বাস

এখন যদি উনি বলতে পারেন উনি সত্যিই কে, তবেই বিশ্বাস করি

অসহনীয় রোগ যন্ত্রণার মধ্যে অন্তর্যামী ঠাকুর প্রসন্ন দৃষ্টিতে তাকালেন নরেনের পানে। বললেন

এখনো তোর জ্ঞান হল না রে? এখনো তোর সংশয়? যে রাম সেই কৃষ্ণ, ইদানীং এ দেহে রামকৃষ্ণ

!

রাত প্রায় একটার সময় ঠাকুরের বাহ্যজ্ঞান ফিরে এলো।

আমি খাব। আমার ভীষণ খিদে পেয়েছে

ঠাকুর উঠে বসলেন। শশী ঠাকুরকে খাইয়ে দিতে লাগলো ভাতের পায়েস। ঠাকুর অনায়াসে তা খেতে লাগলেন

ঠাকুর শেষ বার কালী নাম উচ্চারণ করে গভীর সমাধিতে মগ্ন হলেন

কালী
-কালী
-কালী

এ সমাধি আর ভাঙলো না। ঠাকুর তাঁর নশ্বর দেহ ত্যাগ করে প্রস্থান করলেন অমর লোকে।

তিনিই রাম, তিনিই কৃষ্ণ, তিনিই ঈশ্বর। তিনিই মানুষের মঙ্গলের জন্য যুগে যুগে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছেন।